প্রচ্ছদ অমিয় ভট্টাচার্য

বিমলকুমার পাল কর্তৃক ১০এ/৬০ ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন
স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৬ থেকে প্রকাশিত এবং
নিউ ঘোষ প্রেস, ৪/১ই বিডন রো,
কলকাতা ৭০০০০৬ থেকে
অনিলকুমার ঘোষ
কর্তৃক মুদ্রিত।

পিতৃদেব ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের
স্মৃতির উদ্দেশে

লেখকের অন্যান্য বই

সোনার আলপনা

দূরের বই

বিশ্বসাহিত্যের আঙিনায়

সাহিত্যের কথা

শেক্সপীয়র রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য

লেখকদের গল্প

সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার

গ্রন্থবার্তা (দুই খণ্ড)

দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন (সম্পাদিত)

প্রফুল্লকুমার সরকার রচনা-সংগ্রহ (সম্পাদিত)

ফুলমণি ও করুণার বিবরণ (সম্পাদিত)

সচিত্র গুলজারনগর (সম্পাদিত)

আনন্দমঠ : রচনার প্রেরণা ও পরিণাম (সম্পাদিত

সিদ্ধার্থ (অনুবাদ)

ভিক্টোরিয়া (অনুবাদ)

বর্তমান গ্রন্থে সঙ্কলিত প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলি বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতি-সম্পর্কিত। প্রবন্ধগুলির মধ্যে এটাই যোগসূত্র রক্ষা করেছে।

রচনাগুলি সঙ্কলন এবং মুদ্রণের সকল ব্যবস্থা করেছেন শ্রীবিমলকুমার পাল। তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ছাড়া এই বই ছাপা সম্ভব হত না।

নিউ ঘোষ প্রেসের শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে বইটি ছেপে দিয়েছেন। এজন্য তিনি আমার ধন্যবাদের পাত্র।

কলকাতা
১৯ জুলাই ১৯৬০

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম বাংলা হরফ ও উইলিয়াম বোলট্‌স

বাংলা মুভেবল টাইপ বা বিচল হরফের আবিষ্কর্তা হিসাবে চার্লস উইলকিনসের নাম সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর তৈরি হরফেই হলহেডের ব্যাকরণের বাংলা উদাহরণগুলি ছাপা হয়েছিল। বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসকাররা কখনো কখনো নাম করেন উইলিয়াম বোলট্‌সের। তিনি নাকি উইলকিনসের আগেই বাংলা বিচল হরফ তৈরি করবার চেষ্টা করেছিলেন। বোলট্‌সের প্রচেষ্টা কতদূর এগিয়েছিল তা প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন হলহেড এবং উইলকিনস। এঁরা, এবং যাঁরা তাঁর কাজ দেখবার সুযোগ পাননি তাঁরাও, বোলট্‌সের চরম ব্যর্থতার কথাই বলেছেন।

কিন্তু বাংলা মুদ্রণের বিবর্তনের ইতিহাসে বোলট্‌সের নাম অনুল্লেখিত রাখা চলে না। আমাদের কাছে বোলট্‌সের পরিচয় শুধু একজন ভাগ্যান্বেষী হিসাবে। এটুকুই তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় নয়।

উইলিয়াম (বা উইলেম) বোলট্‌স জন্মগ্রহণ করেছিলেন হল্যাণ্ডে, আনুমানিক ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে। জন্ম আমস্টারডামে হলেও আসলে বোলট্‌স জার্মান, একথা তাঁর নিজের দেওয়া তথ্য থেকেই জানা যায়। ইংরেজ লেখকরা ভুল করে তাঁকে 'ডাচ' হিসাবে প্রচার করেছেন। মাত্র পনেরো বছর বয়সে ভাগ্যের অন্বেষণে তিনি দেশ থেকে ইংলণ্ডে চলে যান। কিছুকাল পরে ইংলণ্ড ছেড়ে যাত্রা করলেন লিসবনের পথে। ইংলণ্ডে কাজের সুবিধা করতে না পারায় পর্তুগাল এলেন। কিন্তু এখানে আসবার অল্প পরেই ১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দের ভয়াবহ ভূমিকম্প হল। প্রাণ বাঁচল, কিন্তু দেখলেন এমন দুর্বিপাকের মধ্যে এদেশে শিগ্‌গির কোনো কাজকর্মের সুবিধা হবার নয়। তাই পাড়ি দিলেন ভারতের দিকে। তথাকথিত অন্ধকূপ হত্যার ঠিক পরেই এসে পৌঁছলেন কলকাতা। সেটা ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের জুন মাস। ইংরেজদের মধ্যে বেশ একটা আতঙ্কের ভাব। নতুন চাকরিপ্রার্থীর আসা কমে গেছে। এই পরিবেশে বোলট্‌স সহজেই কোম্পানীর দপ্তরে কেরানীর চাকরি পেলেন। বুদ্ধিমান এবং উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন বোলট্‌স। তাই ১৭৬২ খ্রীস্টাব্দেই তাঁকে দেখতে পাই একটি কুঠীর কর্তা হিসাবে।

তিন বছর পরে (১৭৬৫) আর-একবার পদোন্নতি। বেনারস কাউন্সিলের সহ-প্রধান। কিন্তু সে বছরই তাঁকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হল। তাঁর বিরুদ্ধে

গুরুতর অভিযোগ। তিনি কোম্পানীর উচ্চ পদের সুযোগ নিয়ে ব্যক্তিগত ব্যবসা করেছেন, কোম্পানীর স্বার্থ না দেখে দেখেছেন নিজের স্বার্থ এবং অবৈধ উপায়ে সঞ্চয় করেছেন প্রচুর অর্থ। কোম্পানীর স্থানীয় কর্তাদের চাপে পড়ে তাঁকে চাকরিতে ইস্তফা দিতে হয় ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে।[১]

কোম্পানী তাঁকে আবার নতুন চাকরি দিল। মেয়রস্ কোর্টের অলডারম্যান বা বিচারক হলেন তিনি। কর্তৃপক্ষের হয়ত ধারণা হয়েছিল যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলে বোলট্স কোনো ক্ষতি করতে পারবেন না। কিন্তু তাঁদের এ আশা সফল হয়নি। নানাভাবে তিনি কোম্পানীর প্রশাসনকে উদ্ব্যস্ত করে তুললেন। বিশেষ করে তাঁরা বিব্রত হলেন যখন জানা গেল বোলট্স দেশীয় রাজা-বাদশাদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করে কোম্পানীর স্বার্থবিরোধী কাজ করছেন। কোম্পানী তাই এক আদেশ জারি করে মেয়রস্ কোর্টের অলডারম্যানের পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেয়। আর দেওয়া হয় ভারত ত্যাগ করবার নির্দেশ। বোলট্স তা পালন করেননি। কলকাতার গভর্নরের কাউন্সিলের ৫ নভেম্বর ১৭৬৭ তারিখের সভায় বোলট্সের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি আর-একবার আলোচনা করা হয়। সেইসব অভিযোগ হল: কোম্পানীর গভর্নরের প্রতি তাঁর উদ্ধত ও বিদ্রোহমূলক ব্যবহার; কাউন্সিলের সভ্যদের মধ্যে ঈর্ষা ও বিভেদের বীজ বপনের অপচেষ্টা; সাধারণের মনে প্রশাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে উসকানি দেওয়া; শুধু কলকাতার অধিবাসীদের মধ্যেই এটা নিবদ্ধ ছিল না, সমগ্র বাংলার শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তাঁর কার্যকলাপে; স্বাধীনতার ডাক দিয়ে বিভেদ সৃষ্টির মারাত্মক খেলা খেলছেন বোলট্স। মোটামুটি এগুলি ছিল নতুন অভিযোগ। আলোচনার শেষে কাউন্সিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন:

"Resolved, that our former orders to Mr. Bolts for proceeding to England shall be repeated, and that, in case of disobedience to, and contempt of our authority, his person shall be seized and forcibly sent home a prisoner in one of the ships in this season."[২]

কাউন্সিলের এই আদেশ পেয়ে বোলট্স এক উদ্ধত ও অপমানজনক চিঠি লিখলেন। ভারত ত্যাগে তাঁর শর্ত হল: কোম্পানী "would take his concerns and those of his constituents off his hands…." তাঁর ব্যবসাপত্তর সব কোম্পানী কিনে নিলেই তিনি ভারত ত্যাগ করবেন।

১০ ডিসেম্বর ১৭৬৭ কলকাতার কাউন্সিল কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টরসকে এক চিঠিতে বোলট্‌সের কথা নতুন করে জানালেন। ব্যাপারটা এমন গুরুতর হয়ে উঠেছে যে এ-বিষয়ে কোর্টের "most serious consideration" দরকার। অন্যান্য অভিযোগের সঙ্গে এই চিঠিতে একটি নতুন অভিযোগ যোগ করা হল: "...the intelligence we have since received of his informing Monsr. Gentil, a Frenchman at the Court of Sujah Dowla, by letter, that the Company's affairs in Europe are in the utmost confusion and that his associate, Mr. Johnstone, as he terms him, would be appointed Governor on the part of His Majesty."[৩]

কোম্পানীর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের মনোবৃত্তি উপেক্ষা করা চলে না। বোলট্‌সকে ধরাও মুশকিল। বিপদের আভাস পেলেই চলে যান ডাচ কলোনি চুঁচুড়ায়। কলকাতা ত্যাগ না করবার আদেশ তিনি মানেন না। চুঁচুড়ায় কোম্পানী কিছুই করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে বোলট্‌সকে বন্দী করে পাঠিয়ে দেওয়া হল লণ্ডনে। কিন্তু সহজে নয়। বোলট্‌স সাঙ্ঘাতিক লোক বলে এমন প্রচার হয়ে গিয়েছিল যে জাহাজের কাপ্তেন প্রথমে তাঁকে নিয়ে যেতে রাজি হয়নি। পথে কি কাণ্ড করে বসেন ঠিক নেই! কোম্পানী সম্ভাব্য বিপদের জন্য পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের জামিন স্বীকার করবার পর কাপ্তেন সম্মত হয়।

লণ্ডনে পৌছেই বোলট্‌সের প্রথম কাজ হল একটি পুস্তিকা ছাপিয়ে বেঙ্গল কাউন্সিলের অপকর্মের কথা প্রচার করা। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টরদের সঙ্গে দেখা করে জানালেন তাঁর উপর যেসব অত্যাচার করা হয়েছে তার কথা। প্রতিকার প্রার্থনা করলেন কিন্তু ফল হল উলটো। নানা অভিযোগ এনে কোম্পানী তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল। বোলট্‌স ভারতে উপার্জিত বিপুল পরিমাণ অর্থের কিছুই আনতে পারেননি। আনতে দেওয়া হয়নি। যা কিছু অর্থ লণ্ডনে ছিল তা আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে নিঃশেষ হয়ে গেল। মামলা ছাড়া ইংলণ্ডের জনসাধারণকে বেঙ্গল কাউন্সিলের কার্যকলাপ এবং নিজের কথা বিশদভাবে জানাবার জন্য একটি বড় বই লিখলেন: *Considerations of Indian Affairs; Particularly Respecting the Present State of Bengal and its Dependencies.*

দ্বিতীয় সংস্করণের বইটি ছাপা হয়েছিল ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে। ১৮৪ পৃষ্ঠার বড় আকারের বই; সঙ্গে তৎকালীন বাংলার প্রকৃত জরিপভিত্তিক মানচিত্র। বিখ্যাত

লেখক ও বাগ্মী বার্কের ভারত-নীতি গঠনে এ-বইটি প্রভাব বিস্তার করেছে। কয়েক বছরের মধ্যে বইটির ফরাসী অনুবাদ বেরিয়েছিল। ১৮৫৭-র বিপ্লবের পটভূমিকা ফরাসী জনগণকে অবহিত করাবার উদ্দেশ্যে ঐ সময় বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। ঠিক ঐ বছরই বাংলার প্রাক্তন গভর্নর ভেরেলস্ট একটি বই প্রকাশ করেন, যার মধ্যে বোলট্সের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল।[৪] ভেরেলস্টের বই পড়ে বোলট্স ভাবলেন তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি খণ্ডন করা দরকার। তাই তিনি পূর্বোল্লিখিত বইটির দ্বিতীয় ভাগ দুই খণ্ডে প্রকাশ করলেন (১৭৭৫)। এই ভাগের উপনাম থেকেই তাঁর উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়। বোলট্স বলেছেন এই বইয়ে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে আছে "···a complete Vindication of the Author from the Malicious and Groundless Charges of Mr. Verelst."[৪]

ক্লাইভ ফেব্রুয়ারি ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে ভারত থেকে বিদায় নেবার পর ভেরেলস্ট গভর্নর হন। এঁর কার্যকালেই বোলট্সের লাঞ্ছনা চরমে ওঠে। সেজন্যই ভেরেলস্টের প্রতি বিদ্বেষের ভাব ছিল। বোলট্সের বিরুদ্ধে যত অভিযোগ উঠেছিল তার সবই যে সত্য বা গুরুতর তা না-ও হতে পারে। কারণ ভেরেলস্ট ছিলেন অক্ষম প্রশাসক, তাঁর অর্থলিপ্সাও ছিল প্রবল। ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দেই তাঁকে গভর্নরের পদ থেকে বিদায় নিতে হয় এবং লণ্ডনে ফিরে যাবার পর তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের বিচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[৫] সুতরাং বোলট্সের বিরুদ্ধে হয়ত সব অভিযোগ নিছক প্রশাসনিক স্বার্থেই করা হয়নি।

যাই হোক, বোলট্সের যে অর্থ লণ্ডনে ছিল তা মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে এবং তিন খণ্ড বিরাট বই ছাপাতে নিঃশেষ হয়ে গেল। এখন নতুন কিছু করতে হবে। তিনি লণ্ডনে অস্ট্রিয়ার দূতের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁকে প্রস্তাব দিলেন প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ব্যবসা করবার। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যেমন জাহাজ-বোঝাই ধনরত্ন নিয়ে আসছে, অস্ট্রিয়াও তেমনি ভাবে সমৃদ্ধ হতে পারবে যদি ব্যবসা করে ভারত ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে। বোলট্স তাঁর ব্যবসার দক্ষতা এবং প্রাচ্যের অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন। প্রস্তাবটা মনে ধরল অস্ট্রিয়ান দূতাবাসের অধিকর্তার। সুতরাং তাঁরই উদ্যোগে অস্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী মারিয়া টেরেসার সঙ্গে দেখা করলেন বোলট্স। প্রাচ্যে বাণিজ্য বিস্তারের প্রস্তাব মারিয়ার খুবই ভাল লাগল। বোলট্স অস্ট্রিয়ান নাগরিকত্ব পেলেন, তাঁকে দেওয়া হল লেঃ কর্নেলের মর্যাদা এবং ৫ জুন ১৭৭৫ তারিখ সংবলিত একটি সনদ পেলেন। এই সনদের সাহায্যে তিনি বিধিবদ্ধ করলেন একটি কোম্পানী, যা বাণিজ্য করবে

এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে। বোলট্‌স প্রথম কুঠী করলেন মালাবার ও করমণ্ডল উপকূলে, নিকোবর দ্বীপে এবং তাছাড়া আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলেও। কয়েক বছরের মধ্যেই কুঠীগুলি একে একে উঠে গেল এবং কোম্পানী ফতুর হয়ে পড়ল ১৭৮১-তে। কোম্পানী বন্ধ হয়ে যাওয়াতে বোলট্‌স দমলেন না। অষ্ট্রিয়া ফিরে এসে আর-এক নতুন কোম্পানী গড়লেন। এই কোম্পানীর নাম হল ট্রিয়েনটাইন সোসাইটি; মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য। ১৭৮৩-র শেষের দিকে এই নতুন কোম্পানীর একটি জাহাজ যাত্রা করে পণ্য নিয়ে। বোলট্‌সের দুর্ভাগ্য, তাঁর প্রচেষ্ট সফল হল না। ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানী দেউলিয়া হয়ে গেল। এই ব্যর্থতার পর বোলট্‌স অষ্ট্রিয়া ত্যাগ করে চলে গেলেন প্যারিস।

প্যারিস পৌঁছে বোলট্‌স এক নতুন পরিকল্পনা পেশ করলেন ষোড়শ লুইয়ের কাছে। এ-কাজে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন বিখ্যাত ফরাসী লেখিকা মাদাম গু স্তালের স্বামী। লুই তাঁর পরিকল্পনা গ্রহণ না করায় বোলট্‌স চলে এলেন সুইডেনের রাজা তৃতীয় গুস্তাভাসের দরবারে। বোলট্‌সের পরিকল্পনা ছিল দুটি ভাগে বিভক্ত: এক, এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য; দুই, একটি নতুন দ্বীপ—যেখানে এখনো কোনো বসতি নেই—সেই দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করা। এই দ্বীপের অস্তিত্ব তাঁর জানা ছিল, কিন্তু নাম করেননি, পাছে জানতে পেরে অন্য কেউ আগেই সেটা দখল করে নেয়!

পরিকল্পনা এমন বিশদরূপে রচিত হয়েছিল যে বোলট্‌সের দক্ষতা এবং এশিয়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হতে হয়। ক'টি জাহাজ নিয়ে কাজ আরম্ভ হবে, নাবিক ক'জন থাকবে, জাহাজের কাপ্তেন কোন্ দেশের লোক হবে, সৈন্য থাকবে ক'জন, কি ধরনের অস্ত্রের প্রয়োজন, কার কত বেতন ইত্যাদি সব কিছু পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে। সঙ্গে একজন উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী এবং একজন ধাতুবিজ্ঞানী চাই। কাঠ এবং নানারকম ধাতু সংগ্রহ করে আনতে হবে য়ুরোপের বাজারে। সেই অজানা দ্বীপের নতুন উপনিবেশ থেকে পাওয়া যাবে তুলা, চিনি ও রেশম। একটি নিঃশুল্ক বন্দর গড়তে হবে। উপনিবেশে ধর্মাচরণের স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। না হলে ভারতীয় এবং চীনাদের আকৃষ্ট করা যাবে না।

উপনিবেশের গভর্নর হবেন বোলট্‌স। তিনি উপনিবেশের সর্বময় কর্তা। আজীবন এই পদে তিনি অধিষ্ঠিত থাকবেন। যদি অসুস্থ হয়ে দেশে ফিরতে হয় তবে তাঁকে সুইডেনের রাজা কনসাল-জেনারেলের চাকরি দিয়ে য়ুরোপের কোনো

দক্ষিণ দেশে পাঠাবেন। তরুণ বয়স থেকে গরম আবহাওয়ায় তিনি অভ্যস্ত, সুতরাং য়ুরোপের উত্তরাঞ্চলে সুস্থ থাকবার সম্ভাবনা নেই। নতুন উপনিবেশের নাম হবে 'বোলট্সহোম', তাঁর নাম অনুসারে। সুইডিশ ভাষায় 'holm'-এর অর্থ দ্বীপ। বোলট্সের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পর পর্যন্ত গভর্নরের বেতন ইত্যাদি দিয়ে যেতে হবে। তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করা হবে, এই টাকা দিয়ে তার কাজ চলবে। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হবে উপনিবেশের বাসিন্দাদের কল্যাণসাধন করা। বোলট্সের এই শর্ত থেকে মনে হয় তিনি ছিলেন অবিবাহিত।

সিন্ধুনদের ব-দ্বীপের নিকটবর্তী কোনো উপযুক্ত জায়গায় বাণিজ্যিক কুঠী স্থাপনের প্রস্তাবটিও বিচক্ষণতার পরিচায়ক। কারণ ইউরোপিয়ান বণিকরা তখনো ভারতের এই অংশে কুঠী করেনি। কুঠীর কর্তা বছরে পাবে ৪০০০ টাকা মাইনে। ছয়জন ভারতীয় নিযুক্ত করা হবে মাসিক সাত টাকা বেতনে। কুঠীর কাজ যাতে সফল হয় তার জন্য তিনি প্রস্তাব করলেন যে, সিন্ধুর নবাব, নানা ফারনবিস এবং টিপু সুলতানের সঙ্গে দেখা করবেন রাজা তৃতীয় গুস্তাভাসের চিঠি নিয়ে। তাঁদের দেবেন নতুন আবিষ্কৃত জিনিসের উপঢৌকন—যেমন ইলেকট্রিক মেশিন, ম্যাজিক লণ্ঠন ইত্যাদি।

বোলট্সের ভয় ছিল ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে। তারা যদি পরিকল্পনার কথা জানতে পারে তাহলে বাধা দেবে। বিশেষ করে আশঙ্কা, বোলট্সের বিরুদ্ধে গুস্তাভাসের কাছে লাগাবে। তাই তিনি এক ধরনের সাঙ্কেতিক লিপি উদ্ভাবন করলেন যা চিঠিপত্রে ব্যবহার করা হবে। এই লিপিতে বোলট্স হবেন জে. পারি, বেঙ্গল বোঝাতে লেখা হবে বালটিমোর, ইত্যাদি।

এই বিস্তৃত পরিকল্পনা সুইডেনের রাজাকে দেওয়া হল ৩ অক্টোবর, ১৭৮৬। সব প্রস্তাবই অনুমোদন লাভ করল। ঠিক হল ১৭৮৭-র অগাস্টে দুটি জাহাজ বোলট্সকে নিয়ে যাত্রা করবে গোটেনবার্গ বন্দর থেকে। সময় যখন এল তখন কিন্তু জাহাজ যাত্রা করল না। সুইডেন তখন রাশিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হবে এইরকম আশঙ্কা করছে। তাই গুস্তাভাস বোলট্সের পরিকল্পনা কার্যকর করতে দ্বিধান্বিত। বোলট্সের স্মারকপত্রের উত্তরে দুবার তাঁকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হল। দেওয়া হল তাঁর "genius, enlightenment, distinguished talents"-এর স্বীকৃতি হিসাবে।

সুইডিশ সরকারের সঙ্গে চুক্তি সই হয়েছে ২ নভেম্বর, ১৭৮৬। কিন্তু সরকার

যদি চুক্তি সময়মত পালন না করে তাহলে তিনি কি করবেন? অনেকদিনের জন্য বহু দূর দেশে বাস করতে হবে, তাই তিনি ত্রিয়েস্তে থেকে বই কিনছেন। সুইডেনের এক মন্ত্রীকে চিঠিতে লিখেছিলেন (৯. ১১. ১৭৮৬), আমি যে জাহাজে যাব সেখানে আমার কেবিনের পাশে থাকবে আমার লাইব্রেরির জায়গা। লাইব্রেরির জন্য কত শেলফ লাগবে তারও হিসাব দেওয়া হয়েছে চিঠিতে। বই প্রিয় সঙ্গী, তাই লাইব্রেরি সঙ্গে যাবে: "...without which he will be but a body without a soul."

অপেক্ষা করে করে বোলট্স হতাশ। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে প্যারিস থেকে আবার নতুন প্রস্তাব পাঠানো হল। সুইডেন একা যদি পরিকল্পনা কার্যকর করতে দ্বিধা করে তাহলে সার্ডিনিয়ার রাজা অংশীদার হতে পারেন। এ প্রস্তাবেও কাজ হয়নি। ভগ্নহৃদয় বোলট্স এরপর প্যারিসেই দুর্দশার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন।

সুইডিশ সরকারের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ থেকে জানা যায় তিনি ইংরেজী, ফরাসী, স্প্যানিশ, ইটালিয়ান, পোর্তুগীজ ছাড়া দুটি ভারতীয় ভাষা জানতেন। এই দুটি ভাষার একটি নিশ্চয়ই বাংলা, অন্যটি খুব সম্ভব ফারসী। কারণ দেখছি, অভিযানের প্রস্তুতি হিসাবে তিনি যে ক'টি বই কিনতে বলেছেন তাদের মধ্যে আছে জোন্সের 'পার্শিয়ান গ্রামার' এবং রিচার্ডসনের 'পার্শিয়ান-ইংলিশ ডিক্শনারি'।[৬]

ভাগ্য-সন্ধানী বোলট্সের জীবনের রূপরেখা শুধু দেওয়া হল। তাঁর মধ্যে নতুনকে জানবার ছিল প্রবল আগ্রহ। সেই আগ্রহ শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য বা অর্থ উপার্জনের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। তাই কলকাতায় যখন তিনি চাকরি করেছেন তখন উপলব্ধি করলেন এদেশে ছাপাখানা নেই। অথচ য়ুরোপে তিনশ' বছর পূর্বেই মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হয়ে যুগান্তরের সূচনা করেছে। ছাপাখানা প্রবর্তনের বিশেষ উপযুক্ত অনাবাদী উর্বর ক্ষেত্র এই বাংলাদেশ। পশ্চিম ভারতে ছাপাখানা এসেছে অনেক আগেই। কিন্তু সেখানকার ছাপার কাজ প্রধানত ধর্মকেন্দ্রিক। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে মুদ্রণের কলাকৌশল কাজে লাগাবার সুযোগ ছিল না। এর অভাব বোলট্সই প্রথম উপলব্ধি করলেন এবং প্রকাশ্যে তা ঘোষণা করলেন। ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি কলকাতার কাউন্সিল হাউসের দরজায় এবং আরও কয়েকটি প্রকাশ্য স্থানে লটকিয়ে দিয়েছিলেন নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তিটি:

"To The Public,

Mr. Bolts takes this method of informing the public that the want of a printing press in this city being of great

disadvantage in business and making extremely difficult to communicate such intelligence to the community, as is of the utmost importance to every British subject, he is ready to give the best encouragement to any person or persons who are versed in the business of printing, to manage a press, the types and utensils of which he can produce."[৭]

দেশের পূর্বাঞ্চলে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এই প্রথম ঘোষণা। বোলট্‌স শুধু প্রয়োজনীয়তার কথা বলেই ক্ষান্ত থাকেননি, উদ্যোগী মুদ্রাকরকে তিনি সকল প্রকারে সহায়তা করতেও প্রস্তুত ছিলেন। এটা অসম্ভব নয় যে তাঁর এই আগ্রহের পশ্চাতে ব্যক্তিগত কোনো উদ্দেশ্য ছিল। ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দেই তাঁকে কোম্পানীর চাকরি থেকে অবসর নিতে হয়। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন একটি ছাপাখানা থাকলে তাঁর প্রতি অবিচারের কথা, বেঙ্গল কাউন্সিলের কর্তাদের দুর্নীতির কথা ছাপিয়ে প্রচার করতে পারতেন। যে কাজ তিনি লণ্ডনে ফিরে করেছিলেন বই লিখে।

ইংরেজী ছাপার কাজ প্রচলন করায় তাঁর কিছু ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য থাকতেও পারে। কিন্তু বাংলা মুদ্রণে তাঁর যে উৎসাহ সেটা নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে ছিল। কোম্পানীর চাকরি থেকে বিদায় নিয়ে লণ্ডনে বসে তিনি বাংলা হরফ নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছিলেন। উইল্‌কিনস কোম্পানীর চাকরি করতেন, হেস্টিংসের নির্দেশ ছিল এবং অর্থ পেয়েছিলেন, তাই বাংলা হরফ তৈরির কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু বোলট্‌স কোম্পানীর চাকরি থেকে বিতাড়িত হবার পর লণ্ডনে কোনোরকম উৎসাহ বা আর্থিক সহায়তা ছাড়াই বাংলা হরফ তৈরি শুরু করেন। কেউ কেউ বলেছেন, বোলট্‌স নিজেকে প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ হিসাবে জাহির করতেন, তার প্রমাণস্বরূপ বাংলা চর্চার এই উদ্যোগ। আবার কেউ বলেছেন, কোম্পানী বোলট্‌সকে একটি বাংলা ব্যাকরণ রচনার দায়িত্ব দেবার ফলে তিনি বাংলা হরফ নির্মাণে উদ্যোগী হন।[৮] এ দুটি বক্তব্যের সমর্থন করা যেতে পারে এমন কোনো কাগজপত্র আমরা দেখিনি। আসলে ভাগ্যান্বেষী বোলট্‌সের বাংলা মুদ্রণের অনাবিষ্কৃত ক্ষেত্রে এই এক নতুন অ্যাডভেঞ্চার।

বাংলা মুদ্রণের জন্য কি করেছিলেন বোলট্‌স? ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন: "...উইলিয়ম বোলট্‌স বিলাতে এক প্রস্থ (ফাউণ্ট) বাংলা অক্ষর তৈরি করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা একেবারে বিফল হয়।"[৯]

বোলট্সের হরফ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ
ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ
দ ধ ন প ফ ব ভ ম
য র ল ব শ ষ স হ ক্ষ

উইলকিনসের হরফ

বোলট্সের সমসাময়িক হলহেড তাঁর বাংলা ব্যাকরণের ভূমিকায় বলেছেন : "Mr. Bolts…attempted to fabricate a set of types for it, with the assistance of the ablest artists in London. But as he has egregiously failed in executing even the easiest part, or Primary alphabet, of which he has published a specimen, there is no reason to suppose that this project when completed, would have advanced beyond the usual state of imperfection to which new inventions are constantly exposed."[১০]

হলহেড বোলট্সের তৈরি হরফের নমুনা দেখে তাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে অভিহিত করেছেন। হরফ নির্মাণের আদিপর্বের ইতিহাসকার ট্যালবট রীড বোলট্সের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কিছু তথ্য দিয়েছেন।[১১] তা থেকে জানা যায় যে বোলট্সের নির্দেশে লণ্ডনের বিখ্যাত হরফ-নির্মাতা জোসেফ জ্যাকসন ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে কিছু বাংলা হরফ তৈরি করেছিলেন। রীড জ্যাকসনের দপ্তরের পুরনো কাগজপত্র থেকে এই সংবাদ পেয়েছেন। বাংলা হরফের উল্লেখ নেই সেখানে, বাংলাকে বলা হয়েছে "মডার্ন স্যান্সক্রিট", যার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এইভাবে : "a corruption of the character of the Hindoos, the ancient inhabitants of Bengal."[১২]

রীডের মতামতের ওপর নির্ভর করে মুহম্মদ সিদ্দিক খান লিখেছেন যে "বাংলা হরফের জটিল ধাঁচের নমুনা তৈরি করার মত যোগ্যতা বোলট্সের আদৌ ছিল না। বোলট্স বাংলা অক্ষরের যে নকশাগুলো জ্যাকসনকে ছেনিকাটার আদর্শ হিসাবে দিয়েছিলেন সেগুলি অনুপযুক্ত ও অসন্তোষজনক হওয়ায় এ হরফগুলির প্রস্তুতের কাজ কিছুকাল পর্যন্ত স্থগিত থাকে।"[১৩] কয়েক বৎসর পরে উইলকিনস বাংলা হরফ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করেন।

রীড বোলট্সের কাজের নমুনা না দেখেই উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন। হলহেড নমুনা দেখেও তাকে গ্রহণযোগ্য মনে করতে পারেননি। অথচ 'জেণ্টু লজে' তিন বছর পরে বাংলা বর্ণমালার যে নমুনা হলহেড ব্লক থেকে ছেপেছেন তা মোটেই হরফ কাটার উপযোগী নয়। কারণ বাঁকা ছাঁদের এই হস্তাক্ষর হরফ নির্মাণের নমুনা হিসাবে অনুপযোগী। এখানে বোলট্সের নির্দেশে তাঁর নমুনা থেকে তৈরি বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতিলিপি দেওয়া হল। তুলনার সুবিধার জন্য পাঁচ বছর পরে তৈরি উইলকিনসের হরফের নমুনাও দেওয়া হয়েছে। এ থেকে দেখা যাবে বোলট্স মুনশিদের বাঁকা ছাঁদের অক্ষরের বন্ধন থেকে প্রায় মুক্ত হতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং

পাঁচ বছর পরেও উইলকিনস বর্ণমালার ছাঁদ পরিকল্পনায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখাতে পারেননি। বরং দেখা যাবে বোলট্‌সের অনেকগুলি অক্ষর উইলকিনসের অক্ষর অপেক্ষা সুগঠিত। একই বর্ণের দুটি রূপ উইলকিনস ব্যবহার করেছেন। বোলট্‌সের নমুনাতেও

NUM. LVIII.

COPY of a Letter from William Bolts *to* William James, *Esq; one of the* East India *Directors, containing a Proposal for the Introduction of Printing in* Bengal, *and a Specimen of the* Bengal *Alphabet in new-invented Types. Dated the 23d of* September 1773.

To William James, *Esq;*

SIR,

AT my leisure hours, I have sometimes employed myself in contriving a set of types for printing the *Bengal* language, which the present state of my finances will not admit of my finishing, on my own account. Inclosed you have a specimen of the letters of the alphabet, which are finished; but besides which, many compound and conjunctive characters are yet wanting.

As the introduction of printing with these types would be of eminent service in the Company's territorial dominions of *Bengal* and the adjacent provinces, particularly in your revenue-department, I should have no doubt but the Court of Directors would very readily contribute towards the completion of this desirable object, if the proposal did not come from me. But that the time which I have employed in this business may not, therefore, be thrown away, if I can help it, I take this method to know the determination of the Court, and request the favour of your proposing it to them, to take the types, on their own account, upon reasonable terms; and I will engage to compleat all the compound and other characters in a manner fit for printing with the greatest ease. I am, with respect,

SIR,
Your most obedient,
humble servant,

London,
the 23d Sept. 1773. (Signed) WILLIAM BOLTS.

Specimen of the Bengal *Alphabet.*

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ
ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল ৱ শ ষ
স হ ক্ষ

উইলিয়াম জেমসকে লেখা বোলট্‌সের চিঠি

ক, ঘ, ছ প্রভৃতি বর্ণের দুটো রূপ আছে। তবে বোলট্‌স শুধু 'র'-এর পেটকাটা রূপটাই দিয়েছেন; উইলকিনস দু' রকমের 'র' ব্যবহার করেছেন। বোলট্‌সের খ, গ, ঙ, চ,

জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, ল, শ, ষ, স ইত্যাদি হরফের ছাঁদ উইলকিনসের তুলনায় নিম্নমানের নয়। বরং ঞ, প, ল প্রভৃতি হরফের চেহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত মানের বলেই মনে হয়। অথচ মুহম্মদ সিদ্দিক খান মন্তব্য করেছেন: "বিশেষজ্ঞদের মতে বোলট্সের এই ব্যর্থতার দোষ জ্যাকসনের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করা হলে ভুল করা হবে। কেননা জ্যাকসন বোলট্সের দেওয়া হরফের নমুনার হুবহু অনুকরণ করতে পেরেছিলেন। নিকৃষ্ট অক্ষরের নমুনা বা মডেলের জন্য সম্ভবত বোলট্স স্বয়ং অথবা তাঁর নিযুক্ত শিল্পীদের অযোগ্যতাই দায়ী।"[১৪]

বোলট্স যে ব্যঞ্জনবর্ণের পর আর অগ্রসর হতে পারেননি তার কারণ অক্ষম নকশা নয়; মূল কারণ হল অর্থাভাব, পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। বাংলা হরফ তৈরির কাজ বোলট্স ব্যক্তিগত উদ্যোগেই আরম্ভ করেছিলেন ভারত থেকে লণ্ডনে ফিরে এসে। তখন হরফ তৈরি ছিল অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। বিশেষ করে বিদেশী ভাষার হরফ, যা পূর্বে কখনো তৈরি হয়নি। বোলট্সের পঁচিশ বছর পরে উইলিয়াম কেরী বাইবেলের বাংলা অনুবাদ লণ্ডন থেকে ছাপানোর কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু সেখানে ছাপবার খরচের কথা জেনে সে পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হয়েছিল। তখন একটি পাঞ্চ তৈরির খরচ ছিল এক পাউণ্ড।[১৫] বাংলার এক প্রস্থ ছাপার হরফ তৈরি করতে প্রায় ৬০০ পাঞ্চের প্রয়োজন ছিল। এর উপর ঢালাইয়ের ধাতুর দাম, কুশলী কর্মীর মজুরি ইত্যাদি যোগ করতে হবে। বোলট্সের এত টাকা ছিল না। ভারতে সঞ্চিত টাকাকড়ি কিছুই তাঁকে আনতে দেওয়া হয়নি। লণ্ডনে যা ছিল তা আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে এবং তিন খণ্ড বড় বই ছাপতে প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল। অর্থাভাবের জন্যই তাঁর আরব্ধ কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

এ কাজে আর্থিক সহায়তার জন্য তিনি কোম্পানীর নিকট আবেদন করেছিলেন ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে।[১৬] সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন তাঁর "নিউ-ইনভেন্টেড টাইপস"-এর প্রতিলিপি। বোলট্স সরাসরি কোম্পানীকে লেখেননি, কারণ তাঁর সঙ্গে কোম্পানীর বিরোধ চলছিল। তিনি লিখলেন তাঁর পরিচিত ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক ডিরেক্টর উইলিয়াম জেমসকে। বোলট্স সুস্পষ্টরূপে বলেছেন তাঁর চিঠির বিষয় হল: "...a Proposal for the Introduction of Printing in Bengal." এই থেকে দেখা যায় যে হেস্টিংস, হলহেড এবং উইলকিনসের অনেক আগেই বোলট্স বাংলা মুদ্রণের কথা ভেবেছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে

কাজও শুরু করেছিলেন। মুদ্রণ প্রবর্তনের প্রধান শর্ত হল উপযুক্ত বিচল হরফ থাকা চাই। এই কাজে বোলট্‌স হাত দিয়েছিলেন। অবসর সময়ে বাংলা হরফ তৈরির জন্য কাজ করতেন তিনি। সেই পরিশ্রমের ফলেই ব্যঞ্জনবর্ণের হরফগুলি তৈরি হয়েছে। আর্থিক অনটনের জন্য তিনি বাকি প্রয়োজনীয় হরফগুলি তৈরি করতে পারছেন না। বাংলা মুদ্রণ প্রচলিত হলে কোম্পানীর প্রশাসন উপকৃত হবে। শুধু বাংলাই উপকৃত হবে না, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলও এর সুফল ভোগ করবে। বোলট্‌স জানতেন এ প্রস্তাব অন্য কেউ করলে কোম্পানী সাগ্রহে গ্রহণ করত; কিন্তু তাঁর এতদিনের পরিশ্রম যাতে ব্যর্থ না হয় সেজন্য ডিরেক্টর জেমসের মারফত তিনি কোম্পানীর অভিমত জানতে চেয়েছেন। যুক্তিসঙ্গত শর্তে তিনি যুক্তাক্ষর সহ অন্যান্য বর্ণের হরফ তৈরি করে এক প্রস্থ টাইপ কোম্পানীকে দেবেন—যা দিয়ে অতি সহজেই বাংলা বইপত্র ছাপা চলবে।

বোলট্‌সের সমালোচকরা বলেছেন, তিনি নিজেকে প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ বলে জাহির করতেন এবং বলতেন কোম্পানী তাঁকে বাংলা ব্যাকরণ রচনার ভার দিয়েছে। কিন্তু তাঁর চিঠিতে এসব কথার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমনকি, একটি নতুন আবিষ্কারের জন্য গর্বের প্রকাশও নেই।

কোম্পানীর পক্ষ থেকে বোলট্‌সকে কোনো সহায়তা দেওয়া হল না। তাঁর নিজের সামর্থ্য না থাকায় আরব্ধ কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। জীবিকার্জনের জন্যও তাঁকে কিছু একটা করতে হবে। অভিযাত্রীর রক্তে জেগে উঠল নতুন অ্যাডভেঞ্চারের আমন্ত্রণ। এশিয়ার ঐশ্বর্য দেখেছেন তিনি। জাহাজ বোঝাই করে সেখান থেকে আনতে হবে ধনরত্ন। তাহলে হয়ত অর্থের অভাবে বাংলা হরফ কাটা বন্ধ হবে না। হয়ত বা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার গোপন আকাঙ্ক্ষা ছিল মনের গভীর তলায়। অস্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী মারিয়া টেরেসার সহায়তায় বাণিজ্য-পোত নিয়ে পাড়ি দিলেন আফ্রিকা ছুঁয়ে ভারতের পথে। বাংলায় আছে সোনার খনি। কিন্তু সেখানে জাহাজ ভিড়তে বাধা পাবে। তাই ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে বোলট্‌সের জাহাজ নোঙর ফেলল নিকোবর দ্বীপে। সেখানে তাঁর কুঠী স্থাপিত হল, কাছাকাছি কয়েকটি ছোট দ্বীপে অস্ট্রিয়ার পতাকা উড়ল।[১৭]

এদিকে হলহেড আর উইলকিনস বাংলা ব্যাকরণ ছাপানোর কাজ করে চলেছেন। বোলট্‌সের তৈরি বাংলা হরফের নমুনা হলহেড দেখেছিলেন তা তিনি নিজেই বলেছেন। উইলকিনসও দেখেছিলেন একথা মনে করাই স্বাভাবিক। ঢালাইকর জ্যাকসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা খুবই সহজ ছিল। তাই উইলকিনসের

হরফের ছাঁদের সঙ্গে বোলট্সের হরফের সাদৃশ্য বিচিত্র নয়। মনে রাখা দরকার যে ছাপার অক্ষরের ছাঁদ পরিকল্পনার সময় উইলকিনসের সামনে পাণ্ডুলিপির নিদর্শন ছিল অনেক, কিন্তু ছাপার হরফের নমুনা ছিল মাত্র একটি। সেটি বোলট্সের।

নিকোবর দ্বীপে ১৭৭৮-এর এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বোলট্স যখন কুঠীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রাণান্তকর সংগ্রাম করছিলেন সেই সময়ের মধ্যে উইলকিনসের কাটা বাংলা হরফের সাহায্যে হুগলীর প্রেসে ছাপা হল হলহেডের 'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'। বাংলা হরফ তৈরির সাফল্যের জন্য উইলকিনস খ্যাতিলাভ করেছিলেন, তাঁর পদোন্নতি ঘটল। বাংলা হরফের জন্মদাতা হিসাবে স্বীকৃতি পেলেন তিনি।

আর সেই বছরই নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে বোলট্সকে নিকোবর ত্যাগ করতে হল। হয়ত জানতেও পারলেন না তাঁর বাংলা হরফ নির্মাণের স্বপ্ন অন্য-একজন সার্থক করে তুলেছে।

দুঃসাহসী অভিযাত্রী স্বর্ণশিকারী বোলট্সের মনে বাংলা মুদ্রণের চিন্তা কেমন করে স্থান পেয়েছিল, ভাবতে আশ্চর্য লাগে। ভারতবিদ্যায় তাঁর বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার কথা আমাদের জানা নেই। তাহলে একটা কৈফিয়ত পাওয়া যেত। এ কি শুধুই আর-এক ধরনের অ্যাডভেঞ্চার?

বাংলা মুদ্রণ-ভাবনার জনক, বাংলা ছাপার হরফের আদি রূপকার এবং বাংলা গ্রন্থজগতের সূচনাকর্তা বোলট্স প্যারিস নগরীতে চরম দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনার মধ্যে পরলোকগমন করেন ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে।

নির্দেশিকা

১ Temple, R. C. Austria's Commercial Venture in India in the Eighteenth Century, *The Indian Antiquary*, December 1917

২ Long, Rev. J. *Selections from Unpublished Records*. Calcutta 1869, p 482

৩ Do. p. 492

৪ Verelst, Harry. *Rise, Progress and Present State of English Government in Bengal*. London 1772

৫ Buckland, C. E. *Dictionary of Indian Biography*, London 1908

৬ Furber, Holden. In the Footsteps of a German 'Nabob': William Bolts in the Swedish Archives, In *Indian Archives*. Vol. 12 (1958)

৭ Home, Amal, comp. *Descriptive Catalogue of exhibits in the historical Section of the Newspapers and Periodicals Court*, 1948, p. 1

৮ মুহম্মদ সিদ্দিক খান। বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা, ঢাকা ১৩৭১, পৃ ২৬

৯ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্কলক। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় ভাগ, কলকাতা ১৩৮৪, পৃ ১২৫

১০ Halhed, N. B. *A Grammar of the Bengal Language*, Hooghly 1778, Introduction, p. XXXIII

১১ Reed, Talbot Baines. *History of the Old English Letter Foundries* with notes, etc. New ed. London 1952

১২ Do. p. 313

১৩ মুহম্মদ সিদ্দিক খান। বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা, ঢাকা ১৩৭১, পৃ ২৭

১৪ ঐ। পৃ ২৭-২৮

১৫ Sen, Dinesh Chandra. *History of Bengali Language and Literature*, Calcutta 1911, p. 851

১৬ Bolts, William. *Considerations of Indian affairs etc.*, Vol. II, Part II, London 1772-75, p. 285

১৭ *Selections from the Records of the Govt. of India* (Home Deptt.) No. LXXVII, Calcutta 1870, pp. 193-207

বোলট্‌সের একটিমাত্র জীবনীর লেখক এন. এল. হলওয়ার্ড। যতদূর জানি একমাত্র জাতীয় গ্রন্থাগারেই এ বইটি ছিল, কিন্তু বহুদিনের চেষ্টা সত্ত্বেও বইটি দেখবার সুযোগ পাওয়া যায়নি। তাই বোলট্‌সের জীবন-সংক্রান্ত তথ্যে কিছু অসম্পূর্ণতা থাকতে পারে।

আমাদের অভিধান

চীনদেশে নাকি প্রথম অভিধান সঙ্কলিত হয়েছিল ১৫০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে। এরপর থেকে সঙ্কলন-পদ্ধতিতে বিবর্তন ঘটেছে এবং অভিধান ক্রমশ পাঠকের অপরিহার্য সঙ্গী হয়ে উঠেছে। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় বাইবেলের পরেই অভিধানের প্রচার। প্রত্যেক বাড়িতে এক বা একাধিক অভিধান থাকে। অনেকে আবার ছোট আকারের অভিধান পকেটে নিয়ে ঘোরেন। কখনো হঠাৎ কোনো শব্দের অর্থ বা বানান দেখবার প্রয়োজন হলে যেন অসুবিধায় পড়তে না হয়।

প্রাচীন ভারতে অভিধানের বিশেষ মর্যাদা ছিল। তখন এই অভিধান পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। খ্যাতিমান অভিধান-সঙ্কলক অমরসিংহকে বিক্রমাদিত্য তাঁর নবরত্ন সভায় স্থান দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন।

অবশ্য সেদিনের সঙ্কলনরীতি এযুগে অচল। সংস্কৃত অভিধানে তিনটি জিনিসকে প্রাধান্য দেওয়া হত। সেগুলি হল—পর্যায়, নানার্থ ও লিঙ্গ। শব্দগুলিকে বর্গ অনুসারে বিন্যস্ত করে সমার্থক শব্দ দেওয়া এবং লিঙ্গ-নির্দেশ করা ছিল সঙ্কলকের প্রধান কাজ।

বাংলা অভিধানের সূচনা ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে, আস্সুম্পস াঁও-এর বাংলা-পোর্তুগীজ শব্দতালিকার সঙ্গে। এরপর একে একে আপ্জন, ফরস্টার, মোহনপ্রসাদ ঠাকুর প্রভৃতি অনেকে অভিধান সঙ্কলন করেছেন। এইসব অভিধানের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিদেশীদের দৈনন্দিন জীবনে প্রচলিত কিছু বাংলা শব্দ শেখানো। এইসব অভিধানই বাঙালীদের ইংরেজী শব্দ শিখতে সাহায্য করেছে। প্রথম যুগের খাঁটি বাংলা অভিধান 'বঙ্গভাষাভিধান' সঙ্কলন করেছিলেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। স্কুল বুক সোসাইটি বইটি ছাপিয়েছিল ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে।

উইলিয়াম কেরীই আধুনিক রীতিতে প্রথম বাংলা-ইংরেজী অভিধান (১৮২৫) সঙ্কলন করেন, দীর্ঘ পঁচিশ বছরের একক চেষ্টায়। অভিধান ছাপার উপযোগী ছোট টাইপও তৈরি করিয়েছিলেন তিনি। শব্দের ব্যুৎপত্তি দেবার এরকম ব্যাপক প্রচেষ্টা এই প্রথম। তখন ছাপা বইয়ের সংখ্যা এত কম ছিল যে শুধু তাদের উপর নির্ভর করে আশি হাজারের বেশি শব্দ সঙ্কলন করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। কেরী সংস্কৃত-বাংলা পুথি দেখেছেন এবং মুখের ভাষা থেকেও শব্দ সংগ্রহ করে অভিধানে স্থান দিয়েছেন। পূর্ববঙ্গের বৃদ্ধদের মুখে আলোয়ান, গরম চাদর,

শীতবস্ত্র প্রভৃতির পরিবর্তে শোনা যেত 'শীতরি'—'শীতের অরি'। শব্দের পশ্চাতে অর্থের ব্যঞ্জনা কেমন ফুটে ওঠে। এমন সুন্দর শব্দটিকে লোকমুখ থেকে কলমের মুখে আনা হয়নি এখনো, বহুল-ব্যবহৃত অভিধানেও শব্দটি নেই। কথ্যভাষায় প্রচলিত এই 'শীতরি' (শীতবস্ত্র) শব্দটি কেরীর অভিধানে পাই। সংস্কৃতমূলক এমন অনেক শব্দ তিনি নিয়েছেন, যা এখনও পরিভাষা হিসাবে ব্যবহার করা যায়। যেমন, Detergent—মলঘ্ন ; Sinus—অবট ; Warrant—আজ্ঞাপত্র ; Summons—ডাকপত্র ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম পর্বের রচনায় এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন, যাদের শুধু কেরীর অভিধানেই পাওয়া যায়। যেমন, অবশ্যকৃত্য, অবসাদক, রূঢ়ী (মৌলিক) ইত্যাদি। বিশেষ করে মনে পড়ছে 'অবরোহী' শব্দটি। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে আছে : বগুলা স্টেশনে রমেশ অবরোহী যাত্রীদের মধ্যে অক্ষয়ের দেখা পেল না। 'অবরোহী'র অর্থ হল, গাড়ি থেকে যে-যাত্রী নামছে বা এইমাত্র নেমেছে।

মনে হয় কেরী সৃজ্যমান বঙ্গসাহিত্যের নবীন লেখকদের নিকট এক সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডার উপস্থিত করতে আগ্রহী ছিলেন। তাই তিনি নানা সূত্র থেকে শব্দ সংগ্রহ করেছেন, বহু প্রত্যয় ও সমাসযুক্ত পদ অন্তর্ভুক্ত করেছেন অভিধানে। এক 'উপাসনা' শব্দ থেকে তিনি ৭০টি শব্দ তৈরি করেছেন। যেমন, উপাসনাকাঙ্ক্ষী, উপাসনাজনিত ইত্যাদি। ইয়ং বেঙ্গলের তারাচাঁদ চক্রবর্তী তাঁর নিজের সঙ্কলিত অভিধানের (১৮২৭) ভূমিকায় কেরীর এই রীতির সমালোচনা করেছেন। কেরী সমাসবদ্ধ এমন কতকগুলি পদ সঙ্কলন করেছেন, যাদের উচ্চারণ করাই দুরূহ। যেমন, পদবৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠনমনকারিদীর্ঘ—পায়ের বুড়ো আঙুল নাড়াচাড়া করতে যে ক্ষুদ্র পেশীটি কাজ করে তার নাম। যাই হোক, কেরীর অসামান্য কৃতিত্বের তুলনায় এসব ত্রুটি অকিঞ্চিৎকর।

আজকাল অভিধান ব্যবহার করা হয় প্রধানত তিনটি বিষয়ের সন্ধানে—বানান, উচ্চারণ ও অর্থ। সকল শ্রেণীর ব্যবহারকারী এক ধরনের অভিধান থেকে উত্তর না-ও পেতে পারেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং প্রয়োজনের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর অভিধান ব্যবহার করতে হয়। স্কুলের ছাত্র শব্দার্থের যে-ধরনের ব্যাখ্যা চায় তা সে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত অভিধানে পাবে না। এদের প্রয়োজন মেটাতে বিশেষভাবে সঙ্কলিত অভিধান চাই। ছাত্রদের ব্যবহারের উপযোগী অভিধানের মধ্যেও কত ভাগ ! একেবারে প্রাথমিক স্তরের জন্য, তারপর

ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণীর জন্য এবং উচ্চতর শ্রেণীর জন্য নানা মানের অভিধান সঙ্কলিত হয় বিদেশে। তাছাড়া ডাক্তারী শব্দ, অর্থনীতির শব্দ ইত্যাদি নিয়ে আছে পৃথক অভিধান যা বিশেষজ্ঞদের পক্ষে খুবই দরকারী। আরও পাওয়া যায় লৌকিক শব্দের, ইতর ভাষার, এক ভাষা থেকে অন্য ভাষার—ইত্যাদি বহু-বিচিত্র রকমের অভিধান।

পাঠকদের চাহিদা মেটাবার জন্যই অভিধান সঙ্কলনে এই বৈচিত্র্য এসেছে, এবং ক্রমশ তা বেড়েই চলেছে। কিন্তু নানা মানের ও নানা শ্রেণীর অভিধান সঙ্কলন তখনই সম্ভব হয় যখন সংশ্লিষ্ট ভাষায় একটি নির্ভরযোগ্য বৃহৎ অভিধান থাকে। এই প্রামাণিক অভিধান অবলম্বন করে নানা ধরনের অভিধান সঙ্কলন করা সহজ হয়।

বাংলায় একটি প্রামাণিক অভিধানের অভাব আছে। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য এরূপ একটি অভিধান অপরিহার্য। এমনি একটি নির্ভরযোগ্য অভিধান সঙ্কলিত হলে তার উপর ভিত্তি করে সর্বদা ব্যবহারের জন্য নানা মানের ও বিবিধ শ্রেণীর অভিধান সঙ্কলনের কাজ সহজ হবে। এই প্রামাণিক অভিধানটি কেমন হবে, কোন্ পদ্ধতিতে সঙ্কলন করা হবে—তার আদর্শ স্থাপন করেছে অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিক্‌শনারি। এর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সঙ্কলনের কলাকৌশল জানা যাবে।

ইংরেজী ভাষার প্রথম উল্লেখযোগ্য অভিধান সঙ্কলন করেছেন ডঃ স্যামুয়েল জনসন। পরিকল্পনাটি তাঁর নিজের ছিল না। কয়েকজন প্রকাশক অভিধান প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ডঃ জনসনকে সঙ্কলনের দায়িত্ব দেয়। জনসনের অভিধান শব্দের বানান ও অর্থ নির্দিষ্ট করে দেয়। তাঁর অভিমত সবাই মেনে নিয়েছে। জনসনের ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্যের এমনই প্রভাব ছিল। তাঁর অভিধানের একটি নতুন বৈশিষ্ট্য ছিল, বড় বড় লেখকদের প্রয়োগের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে শব্দার্থের ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট করা।

আট বছর প্রায় একক প্রচেষ্টায় জনসন অভিধান সম্পন্ন করেছিলেন ১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দে। এক শতাব্দীর অধিককাল পর্যন্ত এই অভিধানের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন অভিধানের প্রয়োজন দেখা দিল। শব্দপ্রয়োগে অরাজকতা দেখে ভাষাবিজ্ঞানীরা শঙ্কিত হলেন। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডন ফাইলোলজিকাল সোসাইটি এক সভার আয়োজন করে অভিধান সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেন। এই আলোচনার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন ফ্রেডারিক জেমস ফার্নিভ্যাল। প্রথমে স্থির হয়েছিল নতুন শব্দ এবং শব্দের নতুন প্রয়োগ সঙ্কলন

করে কোনো একটি প্রচলিত নির্ভরযোগ্য অভিধানের পরিশিষ্ট হিসাবে ছাপিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু পরে দেখা গেল, এটা সম্ভব নয়। সুতরাং নতুন অভিধান সঙ্কলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কবি কোলরিজের আত্মীয় হার্বার্টকে সম্পাদক নিযুক্ত করে নতুন অভিধানের কাজ শুরু হয়ে গেল। সম্পাদনার জন্য হার্বার্ট নানা পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। কিন্তু কাজ বেশিদূর না এগুতেই—মাত্র দু' বছর পরে—তাঁর মৃত্যু হয়।

একের পর এক অনেক সম্পাদক সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। প্রস্তাবের সূচনা থেকে অভিধানের মুদ্রণ সমাপ্ত হতে সময় লেগেছিল দীর্ঘ পচাত্তর বছর। শেষ সম্পাদক জেমস মারে ছিলেন সাধারণ স্কুল মাস্টার ; পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল না, বইপত্র বিশেষ কিছু লেখেননি, কিন্তু অভিধানের কাজ নিয়ে মত্ত হতে পারতেন। আর ছিল তাঁর সংগঠনের ক্ষমতা। শুধু যে সম্পাদক এবং তাঁর সহকর্মীরাই এই বিরাট কাজ সম্পূর্ণ করেছেন, তা নয়। এঁদের সহায়তা করেছেন প্রায় আটশ স্বেচ্ছাকর্মী। শব্দার্থের বিবর্তনের ইতিহাস এবং প্রয়োগের দৃষ্টান্ত সঙ্কলনে এঁদের কাজ বিশেষ সহায়ক হয়েছে। ফাইলোলজিকাল সোসাইটি বইয়ের তালিকা তৈরি করে স্বেচ্ছাকর্মীদের দিয়েছেন, তাঁরা সেসব বই পড়ে শব্দপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত স্লিপে লিখে দিয়েছেন। একজন স্বেচ্ছাকর্মী এক লক্ষ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—তারও নজির আছে। স্বেচ্ছাকর্মীদের কাছ থেকে যেসব স্লিপ পাওয়া গিয়েছিল, তাদের মোট ওজন ছিল প্রায় দুই টন। এই সহায়তা পাওয়ায় সঙ্কলন ঐতিহাসিক রীতিতে করা সম্ভব হয়েছে। এতবড় কাজ স্বেচ্ছায়, বিনা পারিশ্রমিকে করে দেওয়ায় শিক্ষিত ইংরেজের মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। কিছুকাল পরে আমেরিকান ইংরেজীর যে বৃহৎ অভিধান সঙ্কলন করা হয়, তাতে কিন্তু সম্পাদক বিনা পারিশ্রমিকে এরূপ সহায়তা পাননি। বাংলাদেশে গ্রাম্য শব্দের যে অভিধান সঙ্কলন করা হয়েছে, তার জন্য শব্দ ও তথ্য-সংগ্রাহকদের পারিশ্রমিক দিতে হয়েছে।

বাংলা অভিধানের আলোচনায় এসব কথা অবান্তর মনে হতে পারে। তবু যে উল্লেখ করা হল, তার কারণ দুটি। প্রথমত, একটি প্রামাণিক অভিধান সম্পাদনা করতে হলে অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিক্‌শনারির সঙ্কলন-রীতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া অত্যাবশ্যক। অভিধান সঙ্কলনের ক্ষেত্রে পৃথিবীর সর্বত্র এই গ্রন্থ আদর্শ হিসাবে আজও স্বীকৃত। দ্বিতীয়ত, সরকার বা কোনো প্রতিষ্ঠান যিনিই এই অভিধান সঙ্কলনের আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, তাঁদের ধৈর্য ধরতে হবে। পচাত্তর বছর

না হোক, পনেরো-কুড়ি বছর সম্পাদককে নিবিষ্টচিত্তে কাজ করবার সুযোগ দেওয়া চাই। তাগিদের পরিবেশে প্রামাণিক কাজ করা সম্ভব নয়। কত ভেবেচিন্তে গবেষণা করে যে এ-ধরনের অভিধানের কাজ করতে হয়, তার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। অক্সফোর্ড অভিধানে 'সেট্' ক্রিয়াপদের বিভিন্ন অর্থ লিখতে ভারপ্রাপ্ত সহকারী সম্পাদকের মোট সময় লেগেছিল চল্লিশ ঘণ্টা। যিনি এর লেখা সংশোধন ও পরিমার্জন করতেন তাঁর আবার লেগেছে আরও চল্লিশ ঘণ্টা। প্রামাণিক করতে হলে এমনি খুঁটিয়ে সময় দিয়ে কাজ করতে হয়।

অভিধান সঙ্কলন করবার আগে হিসাব নিতে হবে, এ-পর্যন্ত কি কাজ হয়েছে। সঙ্কলনের নতুন রীতি গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু পূর্ববর্তী সঙ্কলকদের পরিশ্রমের ফল উপেক্ষা করা যায় না। পূর্ববর্তী অভিধানের শব্দসম্ভার, শব্দের ব্যুৎপত্তি, প্রয়োগের দৃষ্টান্ত, শব্দের অর্থ ইত্যাদি থেকে প্রভূত সহায়তা পাওয়া যাবে।

বানান, উচ্চারণ ও অর্থের জন্য আমরা অভিধান ব্যবহার করি—একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। বাংলা অভিধানে একমাত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসই উচ্চারণ নির্দেশের সঙ্কেত দিয়েছেন। আমরা অবশ্য উচ্চারণ সম্বন্ধে এতই উদাসীন যে, উচ্চারণের জন্য অভিধানের প্রয়োজন বোধ করি না। বানান দেখার জন্য অভিধানের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। আমাদের অভিধানে প্রায়ই বিকল্প বানান থাকে বলে ব্যবহারকারীর সমস্যার সমাধান হয় না। আবার, বইপত্রে এমন বানান মেলে যা অভিধানে নেই। অনেকের ধারণা, বানান নির্দিষ্ট করে দেবার দায়িত্ব অভিধানের। সঙ্কলকের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি থাকলে তাঁর অভিধানের বানান প্রামাণ্য বলে স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু মুশকিল এই যে, লেখকদের পক্ষে প্রতিটি শব্দের বানান অভিধান কিংবা বানানের নিয়মাবলী (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) মিলিয়ে লেখা সম্ভব নয়। সুতরাং নিয়ম-বহির্ভূত বানান ব্যবহার হওয়া স্বাভাবিক।

বিদেশে বড় বড় প্রকাশকরা নিজস্ব 'হাউস স্টাইল' অনুসারে পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে বানানের নৈরাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করে। ছোট প্রকাশক এবং পাঠক-সাধারণ এই মুদ্রণরীতির নিয়মাবলী গ্রহণ করে নেয়। বানানের ক্ষেত্রে লেখকের খেয়াল-খুশি প্রকাশকের সম্পাদকীয় বিভাগ নির্বিচারে স্বীকার করে নেয় না। প্রকাশক অনেক ভেবেচিন্তে ভাষার মূল নীতি মনে রেখে নিয়মাবলী সঙ্কলন করে। সুতরাং বই ও পত্রপত্রিকা মারফত বানানের একটা যুক্তিসম্মত রূপ শিক্ষিত সমাজে প্রচার লাভ করে এবং ধীরে ধীরে গৃহীত হয়।

তবে বানানও বদলায় নানা কারণে। পুরনো বাংলা পুথিতে, বইয়ে যেসব

ক্ষেত্রে দীর্ঘ 'ঈ' দেখা যায়—তাদের অনেকগুলিই এখন হ্রস্ব 'ই' দিয়ে লেখা হয়। যেমন, বাড়ী—বাড়ি, দিদী—দিদি ইত্যাদি। যাই হোক, অভিধানকারকে এ-সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়।

অভিধানে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয় নিখুঁত শব্দার্থ বিশ্লেষণের উপর। কিন্তু প্রশ্ন হল, কোন্ কোন্ শব্দ অভিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হবে? ডঃ জনসন শুধু সেইসব শব্দ গ্রহণ করেছেন, যাদের তিনি অশালীন মনে করেননি! অশালীন শব্দ তিনি বাদ দিয়েছেন। আজকাল সম্পাদক নিজের রুচিকে শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেন না।

শব্দের অর্থসংজ্ঞা এমন হওয়া উচিত, যার সাহায্যে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির নিকট শব্দটির তাৎপর্য উদ্ভাসিত হবে। অর্থ স্পষ্ট করবার জন্য ব্যুৎপত্তি এবং প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। যথোপযুক্ত অর্থসংজ্ঞার অভাব বাংলা অভিধানের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। অমরকোষের ঐতিহ্য এখনও বাংলা অভিধানে চলে আসছে। অর্থাৎ, শব্দের অর্থ বোঝাতে শুধু প্রতিশব্দ বসানো হয়। যেমন—কমল, পদ্ম, অম্বুজ, পঙ্কজ, উৎপল, শতদল ইত্যাদি। ব্যাখ্যামূলক সংজ্ঞা দিয়ে অর্থ বোঝানো হয় না। এরূপ সংজ্ঞার অভাব ভাষা শেখার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এবং সাহিত্য, বিশেষ করে কাব্য, উপভোগও যথার্থরূপে হওয়া সম্ভব নয়।

অর্থের সংজ্ঞা যে কোথাও দেওয়া হয়নি, তা অবশ্য নয়। তবে সাধারণ রীতি হল, একটি শব্দের বদলে আর-একটি শব্দ বসিয়ে অর্থ বোঝানোর চেষ্টা। এতে অর্থ স্পষ্ট হয় না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাদের বক্তব্য বোঝানো যেতে পারে। যেমন—'বিবাহ' কথাটি। আমাদের দুটি প্রামাণ্য বড় অভিধানে অর্থ দেওয়া হয়েছে এইগুলি: দশবিধ সংস্কারান্তর্গত সংস্কার-বিশেষ, পরিণয়, বহন বা স্বীকার, দারপরিগ্রহ, উদ্বাহ, পাণিপীড়া ইত্যাদি। এতগুলি শব্দ বসানো সত্ত্বেও বিবাহের আসল অর্থ যে কী, তা বোঝা যায় না। বিবাহ প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ করবার সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যার সঙ্গে থাকে আইনের স্বীকৃতি। বাংলা অভিধানের অর্থে সমাজ, ধর্ম ও আইনের স্বীকৃতি নেই। র‍্যাণ্ডম হাউস অভিধানে (এক খণ্ডে) বিবাহের অর্থটি দেখলেই আমাদের অভিধানের দৈন্য ধরা পড়বে—

"*Marriage* : the social institution under which a man and woman establish their decision to live as husband and wife by legal commitments, religious ceremonies, etc."

ইংরেজী অর্থসংজ্ঞায় বিবাহের সব দিকেরই উল্লেখ আছে। অর্থের পূর্ণতা আমাদের তৃপ্ত করে। আমাদের অভিধানে বিবাহকে যে একটি সংস্কার-মাত্র বলা হয়েছে অথবা স্ত্রীকে বোঝা হয়েছে—তা যুগোপযোগী নয়। বর্তমানে এসব অর্থ অচল। স্বামীর নিকট স্ত্রী আর 'বোঝা' নয়, যে-'বোঝা' বহনের দায়িত্ব শুরু করার অনুষ্ঠানকেই বলা যায় 'বিবাহ'।

এবার সর্বদা-ব্যবহৃত 'উপন্যাস' শব্দটির অর্থ কিভাবে দেওয়া হয়েছে দেখা যাক। কেরী তাঁর অভিধানে (১৮২৫) অর্থ দিয়েছেন, "A tell or story, an entertaining story." ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে হটন তাঁর বাংলা-সংস্কৃত অভিধানে প্রায় একই অর্থ দিয়েছেন। তারপর থেকে বাংলা সাহিত্যের রূপ দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে। কেরীর আমলে আধুনিক অর্থে কোনো উপন্যাস আমাদের সাহিত্যে বা বিদেশী সাহিত্যে ছিল না। এখন উপন্যাস শাখাকে বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের কথা ভাবা যায় না। অথচ বাংলা অভিধানে এই নতুন শাখার প্রাধান্যের কথা প্রতিফলিত হয়নি। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস উপন্যাসকে বলেছেন, "কাল্পনিক উপাখ্যান, উপকথা ; কল্পিত গদ্যকাব্য।" উপন্যাসের দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করেছেন কাদম্বরী, বাসবদত্তা, দশকুমারচরিত প্রভৃতির নাম। কোনো বাংলা উপন্যাসের নাম দৃষ্টান্ত হিসাবে বাঙালী পাঠকের নিকট উপস্থিত করা হয়নি। কাদম্বরী সংস্কৃত সাহিত্যে উপন্যাস হিসাবে চলতে পারে। কিন্তু এখন ? জ্ঞানেন্দ্রমোহন অবশ্য পরে চেম্বার্স থেকে নভেলের সংজ্ঞা তুলে দিয়ে একালীন অর্থের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিধানে উপন্যাস শব্দটি খুঁজে পাওয়াই কঠিন। কারণ উপন্যস্ত শব্দের মধ্যে উপন্যাসকে ঢোকানো হয়েছে। হরিচরণ উপন্যাসের নবম অর্থ দিয়েছেন: "অস্বাভাবিক কল্পিত উপাখ্যান, উপকথা, গল্প।" দশম অর্থ : "চমৎকারজনক সাংসারিক ঘটনামূলক গদ্যগ্রন্থও নভেল।" একমাত্র দশম অর্থটি উপন্যাসের কিছুটা অর্থবোধক এবং এই অর্থটিই প্রথমে দেওয়া উচিত ছিল। অন্য যেসব অর্থ বাংলা অভিধানে দেওয়া হয়েছে, তদনুসারে বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্প, পঞ্চতন্ত্রের গল্প, রূপকথা প্রভৃতিকে উপন্যাস বললে দোষ দেওয়া যায় না।

কনসাইজ অক্সফোর্ড অভিধানে উপন্যাসের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এই :

"Fictitious prose narrative of book length portraying characters and actions credibly representative of real life in continuous plot."

উপন্যাস এমন একটি ধারাবাহিক কাহিনী, যার দৈর্ঘ্য একটি পৃথক বই হবার উপযোগী। এই কাহিনী লেখা হবে গদ্যে, বাস্তব জীবনের কথা নিয়ে। কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিবর্তন ঘটবে কয়েকটি বিশ্বাসযোগ্য বাস্তব চরিত্রের। এইসব চরিত্রের বিকাশ ঘটবে কতকগুলি জীবনসম্পৃক্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে। উপন্যাসের এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের অভিধানে স্পষ্ট করে বলা হয়নি।

ভাষা ও সাহিত্যের সকল প্রসঙ্গ আলোচনায় আমরা রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে থাকি। শব্দের সুস্পষ্ট এবং যথার্থ অর্থনির্ণয়ের জন্যও তাঁর উদ্যম স্মরণ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন প্রচলিত অভিধানে প্রদত্ত শব্দার্থের সংজ্ঞা দেখে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাই কয়েকটি শব্দের সংজ্ঞা নিরূপণের জন্য 'বালক' পত্রিকায় ১২৯২ সালের পৌষ সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিয়ে পাঠকদের সহায়তা চান। হুজুগ, ন্যাকামি ও আহ্লাদে শব্দ তিনটির সবচেয়ে ভাল সংজ্ঞা যিনি দিতে পারবেন, তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হবে বলে তিনি ঘোষণা করেন।

জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধানে হুজুগের প্রথম সংজ্ঞা পাওয়া যায়—সাময়িক আন্দোলনের উৎসাহ। তাঁর দ্বিতীয় অর্থ—কোলাহল, গোলমাল ব্যাপার, গণ্ডগোল। তৃতীয় অর্থ—গুজব, জনরব, জল্পনা রটনা।

রবীন্দ্রনাথ যে সংজ্ঞাটিকে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন তা এই: "মাথা নাই মাথাব্যথা গোছের কতকগুলো নাচুনে জিনিস লইয়া যে নাচন আরম্ভ হয়, সেই নাচনের অবস্থাকেই হুজুগ বলে। বিশেষ কিছু হয় নাই অথবা অতি-সামান্য একটা কিছু হইয়াছে আর সেইটাকে লইয়া সকলে নাচিয়া উঠিয়াছে, এই অবস্থার নাম হুজুগ।"

রবীন্দ্রনাথ নিজে বিশদরূপে হুজুগের অর্থ বিশ্লেষণ করে বলেছেন: "আমরা দেখিতেছি হুজুগে প্রথমত এমন একটা বিষয় থাকা চাই যাহার প্রতিষ্ঠাভূমি নাই, যাহার ডালপালা খুব বিস্তৃত। কিন্তু শিকড়ের দিকের অভাব।...দ্বিতীয়ত, ইহার সহিত একটা নাচনের যোগ থাকা চাই, অর্থাৎ কাজের প্রতি ততটা নহে—যতটা মত্ততার প্রতি লক্ষ্য। অর্থাৎ হো হো করিয়া বেশ সময় কাটিয়া যাইতেছে, খুব একটা হাঙ্গামা হইতেছে এবং তাহাতেই একটা আনন্দ পাইতেছি। যদি স্থির হইয়া স্তব্ধভাবে কাজ করিতে বলো তবে তাহাতে মন লাগে না, কারণ নাচানো এবং নাচা, এ দুটোই মুখ্য আবশ্যক। তৃতীয়ত, কেবল একজনকে লইয়া হুজুগ হয় না—সাধারণকে আবশ্যক—সাধারণকে লইয়া একটা হট্টগোল বাধাইবার চেষ্টা। চতুর্থত, হুজুগ কেবল একটা খবর মাত্র রটানো নহে, কোনো অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবার

জন্য সমারোহর সহিত উদ্যোগ করা, তারপরে সেটা হউক বা না হউক।"

ন্যাকামির যে সংজ্ঞাটি রবীন্দ্রনাথ পুরস্কারের যোগ্য বিবেচনা করেছিলেন তা হল, "সেয়ানা হয়ে বোকা সাজা।"

রবীন্দ্রনাথ আহ্লাদের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন : "যে-ব্যক্তি নিজেকে জগতের আদুরে ছেলে মনে করে তাহাকে আহ্লাদে বলে। প্রশ্রয়দাত্রী মায়ের কাছে আদুরে ছেলেরা যেরূপ ব্যবহার করে, সে-ব্যক্তি সকল জায়গাতেই কতকটা সেইরূপ ব্যবহার করিতে যায়। অর্থাৎ যে-ব্যক্তি সময়-অসময় পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সর্বত্র আবদার করিতে যায়, সর্বত্রই দাঁত বাহির করে, মনে করে সকলেই তাহার সকল বাড়াবাড়ি মাপ করিবে, সেই আহ্লাদে।" ইত্যাদি। অর্থের এমন বিশ্লেষণ আমাদের অভিধানে পাওয়া যাবে না।

এই প্রসঙ্গে কবি বলেছেন : "সংজ্ঞা রচনা করা যে দুরূহ তাহার প্রধান একটা কারণ এই দেখিতেছি যে, একটি কথার সহিত অনেকগুলি জটিল ভাব জড়িত হইয়া থাকে, লেখকেরা সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার মধ্যে তাহার সকলগুলি গুছাইয়া লইতে পারেন না—অনবধানতাবশে একটা না একটা বাদ পড়িয়া যায়।" ('রবীন্দ্র রচনাবলী', ১২শ খণ্ড, পৃ ৫৩৩)

কোথাও কোথাও সংজ্ঞা রচনায় সঙ্কলক ভাবার্থ এমন জটিল করে ফেলেছেন যে, তা বোঝবার জন্য পৃথক টীকার প্রয়োজন। যেমন, 'প্রণাম' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "স্বাপকর্ষবোধক শিরঃকরাদি সংযোগ ব্যাপার।" অথচ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এই প্রণাম শব্দের অর্থ অনেক সহজ করে বলেছেন, "সম্পূর্ণ নত হইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ ; ...জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ ও পূজ্যের সম্মুখে মস্তক বা দেহ নত করিয়া যুক্তকর হইয়া অথবা চরণ স্পর্শ করিয়া অভিবাদন।" নমস্কার ও প্রণামের পার্থক্যটি তিনি ব্যাখ্যা করেননি।

আমাদের অতি-পরিচিত 'শাড়ি' কথাটির অর্থ বিচার করে দেখা যেতে পারে। প্রায় সব অভিধানেই শাড়ির সংজ্ঞা হল "স্ত্রীলোকের পরিধেয় বস্ত্র।" নবম সংস্করণ 'চলন্তিকা'য় শাড়ি শব্দের অর্থ খুঁজে পাওয়া কঠিন, কারণ 'শাট' শব্দের ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে শাড়ি শব্দটিকে। মনিয়ার উইলিয়ামস 'শাট' শব্দের অর্থ দিয়েছেন, এ "স্ট্রিপ অব ক্লথ, এ কাইণ্ড অব স্কার্ট অর পেটিকোট...সর্ট অব গারমেন্ট অর গাউন।" শাটী শব্দের অর্থ তিনি দিয়েছেন 'প্রচ্ছদ'। বাংলা অভিধানকাররা শাড়ির ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করতে গিয়ে শাট ও শাটী (জ্ঞানেন্দ্রমোহন) এই দুটি সংস্কৃত শব্দেরই উল্লেখ করেছেন।

শাড়ির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, "স্ত্রীলোকের পরিধেয় বস্ত্র" বলে। বস্ত্র অর্থ জ্ঞানেন্দ্রমোহনের মতে, "আচ্ছাদন, বসন, কাপড়, পরিচ্ছদ।" খুবই ব্যাপক অর্থ। সায়া, শেমিজ, ব্লাউজ, গাউন—সবই হতে পারে। শাড়িও বোঝায়। শাড়িকে বিশেষরূপে চিহ্নিত করবার জন্য যা দরকার, অভিধানে তা নেই। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি এই: শাড়ি সর্বাঙ্গ (আপাদমস্তক) আচ্ছাদনের জন্য স্ত্রীলোকের কাপড়; কাপড়ের পাড় থাকা চাই বা অন্য কোনো কারুকার্য; সাদা বা রঙিন; সাধারণত হিন্দু কুমারী মেয়ে এবং সধবাদের মূল পরিচ্ছদ। অর্থের সংজ্ঞায় এই কথাগুলি স্পষ্ট করে উল্লেখ না করলে কি ধরে নেওয়া যায় না বিধবাদের পরবার থান-ধুতিও শাড়ি? পরিধেয় বস্ত্রমাত্রই যদি শাড়ি হয়, তাহলে রাজস্থানী মেয়েদের ঘাঘরাকেও শাড়ি বলা চলে কি? অথবা গাউনকে?

সমাজে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শব্দার্থেরও যে কখনো কখনো পরিবর্তন ঘটে, তার ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যাবে। পঞ্চাশ বছর আগে সঙ্কলক যদি লিখতেন শাড়ি সধবা ও কুমারী নারীর পরিধেয় বস্ত্র, তাহলে ভুল হত না। কিন্তু এখন? অনেক বিধবাও থান-ধুতি না পরে শাড়িই পরেন। সুতরাং 'সাধারণত' কুমারী ও সধবা নারীর পরিধেয়—এই কথাটি বলতে হবে। হিন্দী 'শব্দসাগর'-এ (১৯২৮) শাড়ির সংজ্ঞা অপেক্ষাকৃত ভাল। সেখানে দেওয়া হয়েছে—"স্ত্রিয়োং কে পড়ননে কী ধোতী, জিস মে চৌড়া কিনারা য়া—বৌল আদি হোতী হ্যায়।"

শাড়ির সঙ্গে অচ্ছেদ্য 'আঁচল' শব্দের অর্থ প্রায় সকল অভিধানেই লেখা হয়েছে, "বস্ত্রের প্রান্তভাগ।" মনে হয় যেন এক সঙ্কলক আর-এক সঙ্কলককে নকল করেছেন। কেরীর আঁচলের সংজ্ঞা হল—"দি বর্ডার অব এ গারমেণ্ট।" তাহলে আমাদের প্রচলিত ধারণা যে 'আঁচল হল শাড়ির অংশবিশেষ'—তা কিন্তু অভিধানের অর্থের সঙ্গে মিলছে না। অভিধানে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে ধুতি, পাঞ্জাবি, সায়া, শেমিজ ইত্যাদির প্রান্তভাগ আঁচল। না-হয় মেনে নেওয়া গেল বস্ত্রের প্রান্তভাগ আঁচল। কিন্তু বস্ত্রের তো চারটে প্রান্ত। যে দুদিকে পাড আছে সেই দুদিককেও কি আঁচল বলা যায়? আঁচল সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ধারণা আছে তা মোটামুটি এই—'শাড়ি বা ধুতির আড়াআড়ি দুই প্রান্তভাগ।'

আমাদের অভিধানের সঙ্গে ইংরেজী অভিধানের পার্থক্য কোথায় তা দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। ধরা যাক 'সুন্দর' শব্দটি। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এর অর্থ দিয়েছেন, "মনোহর, সুরূপা, রমণীয়।" সংসদ অভিধানের অর্থ, "সুদৃশ্য, শোভন, রূপবান, মনোহর।" ওদুদ সাহেবের ব্যবহারিক শব্দকোষের অর্থ, "সুরূপ,

রম্য, রুচির, মনোহর" ইত্যাদি। ইংরেজী অভিধানে 'বিউটিফুল' শব্দটির অর্থ কি দেওয়া হয়েছে তা দেখলে পার্থক্যটা স্পষ্ট হবে। ওয়েবস্টারের নিউ কলেজিয়েট অভিধানের সংজ্ঞা হল—"হ্যাভিং কোয়ালিটিস অব বিউটি অ্যা থ্যাট এক্সাইট্স সেনসুয়াস অর ইসথেটিক প্লেজার।" কনসাইজ অক্সফোর্ডের সংজ্ঞা—"ডিলাইটিং দি আই অর ইয়ার, গ্রাটিফাইং এনি টেইস্ট ; মর‍্যালি অর ইনটেলেকচুয়েলি ইম্প্রেসিভ, চার্মিং অর স্যাটিসফ্যাকটরি।"

বাংলা অভিধানে সুন্দরের যে প্রতিশব্দ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে তা থেকে অর্থের ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু ইংরেজী অভিধান থেকে সেনসুয়াস, ইসথেটিক, ইনটেলেকচুয়াল, মর‍্যাল ইত্যাদি সকল প্রকার সৌন্দর্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। সৌন্দর্য যে কি, তার কতকগুলি দিক আছে এবং সৌন্দর্যের উপলব্ধি যে শুধু চোখ দিয়ে হয় না, কান দিয়ে এবং হৃদয় দিয়েও যে করা যায়, তা ইংরেজী অভিধানের সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট হল।

'সুন্দর' কথাটা না হয় অ্যাবস্ট্রাক্ট। একটি বাস্তব বস্তুবোধক শব্দ ধরা যাক। বালি বা বালু কথাটির অর্থ জ্ঞানেন্দ্রমোহন থেকে সংসদ পর্যন্ত সব অভিধানে দেওয়া হয়েছে প্রতিশব্দ—বালি, বালু, বালুকা। ছোট অক্সফোর্ড ও ওয়েবস্টারে যথাক্রমে অর্থ দেওয়া হয়েছে এই—"মাইনিউট ফ্র্যাগমেন্ট রেজাল্টিং ফ্রম ওয়্যারিং ডাউন অব এস্পেশিয়ালি সাইলিসাস রক্স অ্যাণ্ড ফাউণ্ড কভারিং পার্টস অব দি সী শোর, রিভার বেডস, ডেজার্টস এটসেট্রা।" এবং "এ লুজ গ্র্যানুলার মেটিরিয়েল রেজাল্টিং ফ্রম দি ডিসইনটিগ্রেশান অব রক্স থ্যাট ইজ ইন মর্টার, গ্লাস অ্যাব্রেসিভ্স অ্যাণ্ড ফাউণ্ড্রি মৌল্ডস।"

এখানে-সেখানে বালির স্তূপ অনেক দেখলেও বাংলা অভিধান থেকে জানবার উপায় নেই বালি কী কিংবা 'চোখের বালি'র ইঙ্গিত উপলব্ধি করাও সম্ভব নয়।

একজন ব্যক্তির সম্পাদনায় অভিধান সঙ্কলিত হলে অনেক বিষয়ে সুবিধা হয়। কিন্তু কিছু অসুবিধাও দেখা দেয়, বিশেষ করে অর্থের সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে। একজনের পক্ষে বহুবিস্তৃত শব্দভাণ্ডারের প্রত্যেকটি শব্দের ভাব ও ব্যঞ্জনার সহিত পরিচিত থাকা সম্ভব নয়। তাছাড়া ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশিও অনেক সময় শব্দার্থের উপর ছায়াপাত করে। ডঃ জনসনের পাণ্ডিত্য প্রবাদে পরিণত হয়েছিল ; কিন্তু প্রায়ই তাঁর জ্ঞান আত্মখেয়ালে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত। নিজস্ব মর্জির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় তাঁর অভিধানে। তিনি পেট্রিয়টিজমের অর্থ দিয়েছেন, "শয়তানের শেষ আশ্রয়।" ইংলণ্ডের লোক জনসন জই ('ওট') শব্দের ব্যাখ্যা করে লিখলেন, "ইংলণ্ডে ঘোড়ার

খাদ্য, আর স্কটল্যাণ্ডে মানুষের।" ঘটি-বাঙালের দ্বন্দ্বের মত ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল। তারই প্রভাব হয়ত পড়েছে অর্থের ব্যাখ্যায়। সাবজেকটিভ অভিধানের যুগ শেষ হয়েছে। এখন অবজেকটিভ রীতিতে অভিধান সঙ্কলন করতে হবে। বহু সম্পাদকের মিলিত প্রচেষ্টায়, একজনের সম্পাদনায় নয়।

সাহিত্যকে জাতীয় জীবনের দর্পণ হিসাবে পেতে হলে শব্দসংগ্রহের পরিধি বাড়াতে হবে। ধরা যাক, গোরুর গাড়ি বা ঢেঁকি বা লাঙ্গল প্রভৃতির বিভিন্ন অংশের নাম কি? পল্লীগ্রামের জীবন নিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখতে গেলে কিংবা সামাজিক সমীক্ষার তাগিদে এই ধরনের চাষ-আবাদ অথবা মৎস্য-চাষ সম্বন্ধে শব্দ-প্রয়োগের আবশ্যকতা এসে যাবে। এখন ব্যবহৃত না হলেও ভবিষ্যতে সম্ভাবনা আছে বলে এজাতীয় শব্দ অভিধানের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

শব্দসংগ্রহের ক্ষেত্র বা এলাকা নির্দিষ্ট হয়ে যাবার পর দৃষ্টি দিতে হবে শব্দার্থের সংজ্ঞা নির্ধারণের উপর। শব্দের সুস্পষ্ট অর্থবোধই ভাষা আয়ত্বের প্রথম শর্ত। লেখক, বৈজ্ঞানিক, আইনজীবী প্রভৃতি সকলেরই নিজ নিজ কাজের উৎকর্ষ নির্ভর করে দ্ব্যর্থহীনভাবে শব্দের যথার্থ অর্থ-উপলব্ধির উপর। সঙ্কলনের সব কাজেই যত্ন ও গবেষণা প্রয়োজন। কিন্তু একটি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে লোকের মনে যে কুয়াশাচ্ছন্ন অস্পষ্ট ধারণা থাকে, তাকে সুস্পষ্ট করে তোলা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কঠিন বিশেষ করে এইজন্য যে, সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার সাহায্যে অর্থ ব্যাখ্যা করে দিতে হবে, বিস্তারিত করে লেখার সুযোগ নেই। এখানেই সঙ্কলকের প্রকৃত কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর গভীর ভাষাজ্ঞান এবং দূরদৃষ্টি না থাকলে শব্দার্থের যথার্থ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। সংক্ষেপে ঠিক সংজ্ঞাটি খুঁজে বের করতে সঙ্কলককে হিমশিম খেতে হয়। অর্থের ব্যঞ্জনাকে সংজ্ঞাবদ্ধ করবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তিনি উত্তেজনা বোধ করেন, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তিনি ক্রমাগত আরও ভাল সংজ্ঞা পাবার চেষ্টা করতে থাকেন। সুতরাং এ-কাজে সময় ও ধৈর্য দুই-ই প্রয়োজন।

নতুন নতুন যে-শব্দ ব্যবহার হয়, তাদেরও বাংলা অভিধানে সহজে পাওয়া যায় না। সুপরিচিত 'প্যাণ্ডেল' শব্দটি অধিকাংশ অভিধানে নেই। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দিয়েছেন, লিখেছেন এটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শব্দ। শব্দটি আসলে তামিল থেকে এসেছে। মূল অর্থ, ভজন-কীর্তন ইত্যাদির জন্য সাময়িক আচ্ছাদন। আমরা ভারতীয় ভাষা থেকে আগত শব্দের ব্যুৎপত্তি দিতে পারি না, অথচ ওয়েবস্টার ইণ্টারন্যাশনাল অভিধানে সঠিক ব্যুৎপত্তি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাংলায় শব্দটি কবে থেকে ব্যবহৃত হচ্ছে? কলকাতায় তামিলভাষীদের সংখ্যা-বৃদ্ধির পর থেকে

কি ? আগে আমরা তাঁবু শব্দটি ব্যবহার করতাম। ১৭৮৯ শকের চৈত্রমেলার হিসাবে দেখা যায় 'তাম্বু'র ভাড়া দেওয়া হয়েছে বারো টাকা।

মিলিত প্রচেষ্টায় সঙ্কলিত অভিধান বাংলায় এখনো হয়নি। অনেক বিশেষজ্ঞের মিলিত সাধনায় একটি প্রামাণিক অভিধান আমাদের জরুরী প্রয়োজন। শুধু প্রতিশব্দ বসিয়ে অর্থ দেবার পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করতে হবে। ব্যাখ্যামূলক অর্থ চাই। অবশ্য একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে বাংলা অভিধানের সঙ্কলককে কতকগুলি বিশেষ অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয়। প্রত্যেক শব্দের অর্থ লিখতে বসে যদি সঙ্কলককে গভীর গবেষণা করে মূল তত্ত্ব জানতে হয়, তাহলে কাজ এগোনো শক্ত। বিশেষ করে তথ্যমূলক শব্দের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। আমাদের দেশের প্রাকৃতিক ও বিজ্ঞানসৃষ্ট জিনিসগুলি সম্বন্ধে, প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে যদি সহজে ব্যবহারযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য বই পাওয়া যেত, তাহলে সঙ্কলক সেসব বইপত্র থেকে সাহায্য নিতে পারতেন। অক্সফোর্ড অভিধানের প্রথম প্রস্তাবক এফ. জে. ফার্নিভ্যাল কিছুদিনের জন্য সম্পাদক হিসাবে কাজও করেছেন। কিন্তু সে কাজ ছেড়ে এসে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন বহুসংখ্যক মিডল ইংলিশ ও কিছুসংখ্যক ওল্ড ইংলিশ টেক্সট সম্পাদনায়। এসব গ্রন্থের সুষ্ঠ সম্পাদনা না হলে অক্সফোর্ড অভিধানে শব্দার্থের বিবর্তন দেখানো যেত না। আগে থেকে এমনি করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুষ্ঠুরূপে কাজ করে রাখলে অভিধানকারের সুবিধা হয়, অভিধানের মান উন্নত হতে পারে।

একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা স্পষ্ট করা যাক। আমাদের অভিধানে মৃগ, কুরঙ্গ ও হরিণ প্রায় প্রতিশব্দ হিসাবে দেখানো হয়েছে। মৃগের অর্থ হরিণ ও কুরঙ্গ, আবার হরিণের অর্থ মৃগ ও কুরঙ্গ। এমনি একটির বদলে আর-একটি কথা। যদি তিনটি শব্দ একার্থবোধক হয়, তাহলে অনাবশ্যকরূপে শব্দসংখ্যা বাড়িয়ে জটিলতার সৃষ্টি করা হয়েছে কেন ? আসলে কিন্তু তা নয়। তিনটি শব্দেরই পৃথক ভাবমণ্ডল আছে, যদিও অভিধান থেকে তা পাওয়া যাবে না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর জৈন পণ্ডিত হংসদেব তাঁর 'মৃগপক্ষীশাস্ত্র' গ্রন্থে এই তিন শ্রেণী প্রাণীর পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। যে বৈশিষ্ট্যগুলি হংসদেব লক্ষ্য করেছেন তা এই :

"**মৃগ**—বাদামী রঙ, তার উপর সর্বাঙ্গে নানা রঙের ফোঁটা। বেশ উঁচু হয়। খুব কৃশ, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছুটতে পারে। শিং লম্বা ও সরল। গা থেকে সুন্দর গন্ধ ছড়ায়। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে মিলনেচ্ছা প্রবল।

কুরঙ্গ—ক্ষুদ্রকায়, লাল বর্ণ। শিং ডালপালার মত ছড়ানো। বড় বড় চোখ।

মুখ অনেকটা ছাগলের মত দেখতে। ঘাস খায়। চোখের চাউনি তীক্ষ্ণ। শান্ত। কারো ক্ষতি করে না।

হরিণ—সুন্দর বড় চোখ। ঘন বর্ণ। জল খায়। কারো শিং সরল, কারো বা শাখাপ্রশাখা-সমন্বিত। শরীরের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রঙ।"

হরিণের চোখ সুন্দর, কুরঙ্গের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, মৃগের চোখ সম্বন্ধে বিশেষত্ব কিছু নেই। হরিণের চোখের যে বৈশিষ্ট্য আমাদের সাহিত্যে প্রাচীনকাল থেকে কীর্তিত হয়ে আসছে, তার কোনো ইঙ্গিত অভিধান থেকে পাওয়া যাবে না। মৃগনয়না, কুরঙ্গনয়না বা হরিণাক্ষী দেখলে তাদের অর্থ হয়ত মিলবে। 'মৃগপক্ষীশাস্ত্র'-র মত বই যদি সঙ্কলকের হাতের কাছে থাকে, তাহলে শব্দার্থের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য ব্যাখ্যা সম্ভব।

জাতীয় জীবনে অভিধানের গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে। শুধু ভাষাশিক্ষার জন্যই নয়, ব্যবহারিক জীবনেও এর প্রয়োজন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে শব্দের সঠিক অর্থসংজ্ঞা অপরিহার্য। আমাদের অভিধানে জীবন-সম্বন্ধীয় শব্দের স্বল্পতা চোখে পড়ে। এইসব শব্দ অভিধানে গৃহীত হলে লেখক ও পাঠক—দুই পক্ষেরই সুবিধা।

বাংলা অভিধানকে শুধু দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—এক, আকারে ছোট ও বড়। দুই, শব্দসংখ্যা বেশি বা কম। কিন্তু যেসব দেশ শিক্ষায় উন্নত, সেখানে নানা মানের অভিধান আছে। শিশু, কিশোর, কলেজের ছাত্র প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য অভিধান সঙ্কলিত হয়। আর এদের সঙ্কলনের উৎস হিসাবে গ্রহণ করা হয় যৌথ উদ্যোগে সঙ্কলিত প্রামাণ্য জাতীয় অভিধান। এছাড়া পাওয়া যায় বিষয় অভিধান, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, আইন, মনোবিদ্যা প্রভৃতি প্রসঙ্গের পারিভাষিক শব্দার্থ।

যৌথ উদ্যোগে বৃহৎ আকারের অভিধান সঙ্কলিত হলে অনেক ত্রুটি দূর হওয়া সম্ভব। শব্দসংগ্রহ ব্যাপকতর হতে পারে, একাধিক লোক বিচার-বিশ্লেষণ করে শব্দার্থ নির্দিষ্ট করতে পারে। এই অভিধানই ছোট অভিধানের সঙ্কলকদের পথ দেখাবে। সংজ্ঞা-লেখককে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে তাঁর কাজকে। এলিয়ট বলেছেন, হাঁপানির রোগী যেমন অক্সিজেনের জন্য আঁকুপাকু করে, লেখকরা তেমনি বিশেষ স্থানে সঠিক শব্দটি বসাবার জন্য ব্যাকুল। এমনি ব্যাকুলতা থাকবে অভিধানের অর্থসংজ্ঞা রচয়িতার। টেনিসনের কথায় :

"ওয়ার্ডস্ লাইক নেচার হাফ রিভীল
অ্যাণ্ড হাফ কনসীল দি সোল উইদিন।"

যে অর্থ শব্দের গভীরে গোপনে আছে, তাকে প্রকাশ করাই অভিধানকারের প্রধান কাজ।

বাংলা পঞ্জিকা

অষ্টাদশ শতক থেকেই হিন্দু সমাজের উপরে জ্যোতিষ ও পঞ্জিকার গভীর প্রভাব দেখা যায়। অবশ্য তখন ছাপানো পঞ্জিকা পাওয়া যেত না। ছোট ছোট পুথির মধ্যে বৎসরের গ্রহ-নক্ষত্রের উদয় ও সঞ্চার, দূরে চলে যাওয়ার বিবরণ এবং মানুষের উপরে তাদের প্রভাবের শুভাশুভ পরিণাম সম্বন্ধে সূত্রাকারে লেখা থাকত। এইসব স্বল্পসংখ্যক হাতে-লেখা পুথি ছিল দুষ্প্রাপ্য; তাছাড়া সাধারণের নিকট এদের সাঙ্কেতিক বিবরণ বোঝা ছিল কঠিন। বিশেষ এক শ্রেণীর লোক ছিল পঞ্জিকার ব্যবসায়ী। তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে পঞ্জিকায় লিখিত গ্রহের অবস্থিতি এবং তার ফলাফল জিজ্ঞাসুদের বুঝিয়ে দিত। এই শ্রেণীর লোক 'দৈবজ্ঞ' নামে পরিচিত ছিল। এরা ব্রাহ্মণ হলেও অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের অপেক্ষা একটু নিচু স্তরের। পঞ্জিকা হাতে করে এরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরত এবং পারিশ্রমিক হিসাবে যা পেত সেটাই ছিল একমাত্র জীবিকা।

'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' (অক্টোবর ১৮২৫) এদের সম্বন্ধে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিল। ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর বিচার বিভাগে এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জ্যোতিষীর প্রভাব খর্ব হয়েছিল। কিন্তু হিন্দুর জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রভাব ছিল অপরিসীম। এই প্রভাব বিস্তারে দৈবজ্ঞরা এক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। প্রভাব যাতে হ্রাস না পায় সেদিকে ছিল তাদের সতর্ক দৃষ্টি। কারণ এটাই ছিল তাদের উপার্জনের একমাত্র পথ। প্রত্যেক সম্পন্ন পরিবারেই একজন বেতনভুক দৈবজ্ঞ থাকত। জন্মের পরই নবজাতকের ভবিষ্যৎ জীবন কিরকম হবে তা গণনা করে বলতে হত দৈবজ্ঞকে। জীবনের ফলাফল লিখিতভাবে দিতে হলে মোটা টাকা দক্ষিণা হিসাবে প্রাপ্য ছিল তার। এরপর জাতকের বিদ্যারম্ভ, বিদ্যালয়ে যাওয়া, উপনয়ন, বিবাহ, ব্যবসা, যাত্রা, রোগ ইত্যাদি সকল ব্যাপারেই দৈবজ্ঞকে শুভাশুভ কাল-নির্দেশের জন্য আহ্বান করা হত। রোগের সময় দৈবজ্ঞের গণনার দ্বারা ধার্য করা হত কোন্ গ্রহের জন্য এই অসুস্থতা এবং সেই গ্রহকে তুষ্ট করার জন্য পূজা, কবচ ইত্যাদির ব্যবস্থাপত্র দিত দৈবজ্ঞই। অনেক সময় দৈবজ্ঞের দক্ষিণা ঔষধ ও চিকিৎসকের ব্যয় অপেক্ষা বেশি ছিল। বর্ষফলের জন্য সাধারণত দৈবজ্ঞ পেত পাঁচ টাকা। সে যুগের তুলনায় এই পরিমাণ খুব বেশি বলতে হয়। তারপর মৃত্যু এবং শ্রাদ্ধ ইত্যাদির সময়েও দৈবজ্ঞের

পরামর্শ প্রয়োজন। সুতরাং দৈবজ্ঞকে এড়িয়ে কোনো হিন্দুরই জীবনযাত্রা নির্বাহ সম্ভব ছিল না। তবে মৃত্যু উপস্থিত হলে দৈবজ্ঞের ক্রিয়াকলাপে কোনরকম ফল পাওয়া যেত না। তাই বাংলা প্রবাদে বলা হয়েছে, "যমের বাড়ি নেই পাঁজি পুঁথি।"

দৈবজ্ঞদের ব্যবসা জাঁকিয়ে ওঠে নতুন বৎসর শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে। পঞ্জিকার পুঁথিটি লাল কাপড়ে জড়িয়ে বগলদাবা করে তারা বাড়ি বাড়ি বর্ষফল শোনাবার জন্য ঘুরে বেড়াত। অন্তঃপুরেও দৈবজ্ঞদের অবাধ প্রবেশের অধিকার ছিল। মহিলারা স্নানান্তে শুদ্ধ হয়ে নতুন পঞ্জিকার ফল শুনতে বসত। দৈবজ্ঞকে যথাসাধ্য ভোজ্য ও দক্ষিণা দেওয়া হত। যারা ভিক্ষুককে একমুষ্টি চাল দিতে পরাঙ্মুখ ছিল, তারাও দৈবজ্ঞকে মুক্তহস্তে দান করত।

পঞ্জিকার প্রভাব যে শুধু আমাদের দেশেই ছিল, তা নয়। পৃথিবীর নানা দেশে একটা সময় ছিল যখন পঞ্জিকার গণনা সমাজের লোকদের কম-বেশি প্রভাবান্বিত করেছে। আমাদের দেশের মত অন্ধ বিশ্বাস আর বোধহয় কোথাও ছিল না। যদিও 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র প্রবন্ধকার বলেছেন যে, বর্তমানে ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে এখন জ্যোতিষের প্রভাব আর বড় একটা দেখা যায় না। পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থসমূহের মধ্যে পঞ্জিকা অন্যতম স্থান অধিকার করে আছে। সবপ্রাচীন যে-পঞ্জিকাটি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে, সেটি সঙ্কলিত হয়েছিল মিশরের রাজা দ্বিতীয় র‍্যামেসিসের (১২৯০-১২২৩ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) রাজত্বকালে। এই পঞ্জিকায় কালো এবং লাল কালিতে যথাক্রমে শুভ এবং অশুভ দিনের নির্দেশ করা হয়েছে, ধর্মীয় উৎসবের দিনক্ষণ ঠিক করা হয়েছে; কোন্ দিনে শিশু জন্মগ্রহণ করলে তার জীবনের ফলাফল কি হবে তারও ইঙ্গিত রয়েছে। প্রাচীন মিশর ও আরব দেশে জ্যোতিষের চর্চা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। সেখানকার জ্যোতিষীদের গণনার খ্যাতি সুদূরবিস্তারী ছিল। সুসভ্য গ্রীক ও রোমান জাতিও পঞ্জিকা ব্যবহার করত। জুলিয়াস সীজার নিজে যে অশুভ ইঙ্গিতের কথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তা শেক্সপীয়রের পাঠকরা জানেন।

য়ুরোপে প্রথম মুদ্রিত পঞ্জিকা প্রকাশিত হয় ১৪৫৭ খ্রীস্টাব্দে। আর ইংলণ্ডে প্রথম ছাপা পঞ্জিকা পাওয়া গিয়েছিল ১৪৯৭ খ্রীস্টাব্দে। অবশ্য সেখানে পঞ্জিকার নাম তো ছিল না, বলা হত 'ক্যালেণ্ডার'। প্রথমে ইংলণ্ডে ভবিষ্যদ্বাণী করা নিষিদ্ধ ছিল। তখন 'আবহাওয়া কবে কেমন যাবে' সেই সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ঘরের দেওয়ালে চার্টের আকারে ঝোলানো থাকত। পরে অবশ্য এই নিষেধবিধি উঠে

যাওয়ায় পঞ্জিকা খুব লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়। বিশেষ করে 'স্বাস্থ্য কেমন যাবে'—এইটে জানবার জন্য প্রত্যেক বাড়িতে ডাক্তারী বইয়ের মত যত্ন সহকারে পঞ্জিকা রাখা হত। রাজা প্রথম জেমসের আমলে ইংলণ্ডে পঞ্জিকার কপিরাইট রক্ষা করবার জন্য স্টেশনারী অফিসকে নির্দেশ দেওয়া হয়। এর ফলে প্রকাশকদের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে আদালত থেকে একচেটিয়া ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে রায় দেওয়ায় লাভের পরিমাণ হ্রাস পায়।

আমাদের দেশে বেদের যুগে কোনো না কোনো রকম গণনার প্রচলন ছিল। যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত সময় নির্ধারণ, চাষ-আবাদ আরম্ভ করা, দূর পথে যাত্রা প্রভৃতি নানা প্রয়োজনে গ্রহ-নক্ষত্রের মতিগতি নির্ণয় করবার চেষ্টা কৃষিভিত্তিক দেশের পক্ষে স্বাভাবিক। এছাড়া ঝড-বৃষ্টি-বন্যা, নৌপথে গমনাগমন ইত্যাদির জন্যও অমাবস্যা-পূর্ণিমা, মেঘ-বৃষ্টির পূর্বাভাস জানা ছিল অত্যাবশ্যক।

ভারতে সর্বপ্রথম যজ্ঞানুষ্ঠানের সঠিক কালনির্ণয়ের তাগিদেই কালবিভাগের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। বৈদিক ঋষিরা বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন। সেইজন্য ঋতুবিভাগের দরকার ছিল। সায়ন বা ঋতুনিষ্ঠ বর্ষ গণনা করা হত। সূর্যের অবস্থিতি অনুসারে বৎসরকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করে 'উত্তরায়ণ' ও 'দক্ষিণায়ন' নাম দেওয়া হয়েছিল। বৎসরে মাস ছিল এখনকার মত বারোটি। এর মধ্যে ছ'টি উত্তরায়ণে এবং ছ'টি দক্ষিণায়নে। তখনও তিথি প্রভৃতি সূক্ষ্ম গণনার আবিষ্কার হয়নি। এইরূপ কালবিভাগ যজুর্বেদের আমল অর্থাৎ ১৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। অবশ্য পূর্ণিমা ও অমাবস্যা নিরূপণ করা হত। চান্দ্রমাসের যে কিছু কিছু প্রচলন ছিল, তারও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

আর্যভট্ট, বরাহমিহির ও অন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নানা আবিষ্কারের ফলে ৪র্থ-৫ম শতক থেকে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি সম্বন্ধে সূক্ষ্ম গণনা আরম্ভ হয়। আকাশের গ্রহ মর্ত্যের মানুষের ভাগ্যকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাই নিয়ে একদল ফলিত জ্যোতিষী ধীরে ধীরে ব্যবসায়ে নামেন। দ্বাদশ শতকের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ভাস্করাচার্য কন্যা লীলাবতীর বৈধব্যযোগ এড়াবার জন্য এক শুভ মুহূর্ত নিরূপণ করেছিলেন। কিন্তু অনতিক্রম্য ভাগ্যলিপিকে ফাঁকি দিতে পারেননি।

বাংলাদেশে যাকে 'পঞ্জিকা' বলা হয়, বাংলার বাইরে তা 'পঞ্চাঙ্গ' নামে প্রচলিত। শব্দটি এসেছে সংস্কৃত থেকে। বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণ—এই পাচটি বিষয় নিয়ে পঞ্জিকায় আলোচনা থাকে বলে একে বলা হয় 'পঞ্চাঙ্গ'। তবে বাংলা পঞ্জিকায় যে বিষয়-বৈচিত্র্য এবং ব্যাপ্তি থাকে তা 'পঞ্চাঙ্গে' প্রায় থাকে না।

এবার আমরা বাংলাদেশের পঞ্জিকার কথায় ফিরে আসি। স্মার্ত রঘুনন্দন হিন্দু সমাজে নতুন করে কঠোরভাবে নানারকম ধর্মীয় বিধিনিষেধের নিয়ম প্রবর্তন করেন। তৎকালীন বিদেশী প্রভাব থেকে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করবার জন্য এর হয়ত প্রয়োজন ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সতীদাহ প্রথার পুনঃপ্রবর্তন হবার মূলেও রঘুনন্দনের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাই বিশেষরূপে কাজ করেছিল এবং এর ফলে নদীয়া অঞ্চলের গঙ্গার তীরে নারীদের মধ্যে সহমৃতার দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাছাড়া হিন্দুর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কিভাবে চলবে তাও রঘুনন্দন নির্দেশ করেছিলেন। এই নির্দেশ স্মৃতিশাস্ত্রে লিখিত থাকলেও তা সর্বসাধারণের পক্ষে সর্বদা ব্যবহারোপযোগী নয়। তাই পঞ্জিকার মাধ্যমে এইসব রীতিনীতি, দিনক্ষণ ও লগ্নের শুভাশুভ ইত্যাদির বিচার সকলের নিকট সহজলভ্য হয়ে ওঠে। বলা যায় স্মার্ত রঘুনন্দনই বাংলাদেশে পঞ্জিকা প্রচলনের প্রধান প্রেরণা।

এরপর থেকে সংস্কৃতজ্ঞ এবং স্মৃতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতরা পঞ্জিকা সঙ্কলনে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন পণ্ডিতের সঙ্কলিত পঞ্জিকায় স্বাভাবিকরূপেই কিছু কিছু পার্থক্য দেখা দিত। ইংরেজরা এদেশের শাসনভার গ্রহণ করে প্রথমে দেশীয় তারিখ অনুযায়ী নানাবিধ অনুষ্ঠান এবং রাজকার্য নির্বাহ করত। কিন্তু বিভিন্ন লোকের দ্বারা সঙ্কলিত হাতে-লেখা পঞ্জিকায় প্রায়ই তারিখ ইত্যাদির রকমফের দেখা দেওয়ায় রাজকার্য বিঘ্নিত হত। তাই সরকারের অনুরোধে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বিশিষ্ট পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করে এক আলোচনা সভায় পঞ্জিকা সঙ্কলনের একটি সর্বসম্মত বিধি স্থির করেন। পরবর্তীকালের পাঞ্জিকা এই বিধি অনুসারেই সঙ্কলিত হত।

কৃষ্ণচন্দ্র প্রতি বৎসর নদীয়ার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যানিধিকে দিয়ে পঞ্জিকা সঙ্কলন করিয়ে তার কতকগুলি কপি স্থানীয় নবাব, বিশিষ্ট পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করতেন। এইসব কারণে তিনি ছিলেন বাংলা পঞ্জিকার পৃষ্ঠপোষক। তাই আমরা প্রথমদিকের প্রায় সকল মুদ্রিত পঞ্জিকায় দেখতে পাই সঙ্কলকরা নামপত্রে লেখেন—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুমত্যানুসারে, অথবা নবদ্বীপাধিপতির অনুমত্যানুসারে সঙ্কলিত। এর ফলে শুধু যে ব্যক্তিগতভাবে রাজার অনুমোদন আছে তা বোঝায় না, বোঝায় যে, রাজার অনুগত বিশিষ্ট পণ্ডিত-মণ্ডলীও পঞ্জিকার গণনার সমর্থক।

হাতে-লেখা একটি পঞ্জিকার মূল্য তখন ছিল দু'আনা থেকে এক টাকা পর্যন্ত। মূল্য নির্ভর করত ব্যাখ্যা কম না বেশি আছে তার উপর। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'য় ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দের সংবাদে

দেখা যাচ্ছে, "এতদ্দেশে নবদ্বীপ ও মৌলা ও বায়ইখালি ও বাকলা ও খানাকুল ও বজরাপুর ও বালি ও গণপুর এই সকল গ্রামে পঞ্জিকা প্রস্তুত হয় ইহার মধ্যে কতক আমারদের নিকটে পৌছিয়াছে সকল পঞ্জিকা আইলে আগামী বৎসরের গ্রহণাদি ছাপান যাইবেক।" এখানে হাতে-লেখা পঞ্জিকার উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে ছাপানো পঞ্জিকা নতুন বেরিয়েছে, তখনও বিশেষ প্রচলন হয়নি। লঙ সাহেব আরও কয়েকটি স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন, যেখানকার পুথি-পঞ্জিকা প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চন্দ্রদ্বীপ, জনাই, বকসা, কৃষ্ণনগর, কোদালিয়া, দিগসা ও বিষ্ণুপুর।

এরপর আসে মুদ্রিত-পঞ্জিকার যুগ। প্রত্যেকে বাজার থেকে কিনে পঞ্জিকা নিজের কাছে রাখতে পারত এবং সময়ে-অসময়ে দৈবজ্ঞদের নিকট পরামর্শের জন্য তাদের ছুটতে হত না। এর ফলে দৈবজ্ঞদের ব্যবসায়ে প্রচণ্ড আঘাত পড়ে। তারা তাই মুদ্রিত পঞ্জিকার বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করে। দীর্ঘকাল যাবৎ হাতে-লেখা পুথি-পঞ্জিকা এবং মুদ্রিত-পঞ্জিকা পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত মুদ্রিত পঞ্জিকাতেও গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে বিবরণ এত সংক্ষেপে থাকত যে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে মর্ম উপলব্ধি করা সহজ ছিল না। তখন তাদের দৈবজ্ঞের সাহায্য নিতেই হত। এই সুযোগে দৈবজ্ঞরা বলে বেড়াত যে, বর্ষারম্ভে শিব যেমন পার্বতীকে বৎসরের ফলাফল অবশ্য-কর্তব্য হিসাবে শুনিয়ে থাকেন, তেমনি তারাও (দৈবজ্ঞরা) সেই কাজটি সাধারণ মানুষের জন্য করে। ভক্তিভরে নতুন পঞ্জিকা শুনলে সর্বতীর্থ দর্শনের ফললাভ হয় এবং জীবনের সকল অশুভ দূর হয়। শ্রোতার মনে ভক্তিভাব জাগ্রত করবার উদ্দেশ্যে তারা প্রথমেই সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করত :

> "বারো হরতি দুঃস্বপ্নং নক্ষত্রং পাপনাশনং ॥
> তিথির্ভবতি গঙ্গায়া যোগঃ সাগরসঙ্গমঃ।
> করণং সর্বতীর্থানি শ্রূয়তে দিনপঞ্জিকাঃ ॥"

মুদ্রিত পঞ্জিকার যুগ আরম্ভ হয় উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। এ-পর্যন্ত প্রথম ছাপা যে-পঞ্জিকার সন্ধান পাওয়া গেছে, সেটি ছাপা হয়েছিল ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে। প্রকাশ করেছিলেন জনৈক রামহরি। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৩৫। এই পঞ্জিকায় একটিমাত্র ছবি ছিল, যাতে দেখানো হয়েছে এক দেবী সূর্যের রথ টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। পর বৎসর অর্থাৎ ১৮১৮-১৯ খ্রীস্টাব্দে (বাংলা ১২২৫ সন) যে পঞ্জিকা, সেটি জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। পঞ্জিকাটি খুবই সংক্ষিপ্ত, জ্যোতিষ-বচনাদি অত্যন্ত

কম। রাশিফল ইত্যাদি নেই, আছে শুধু রাশিগত আয়-ব্যয়ের গণনা। পঞ্জিকার শেষে সঙ্কলকের যে নিবেদন ছিল সেটি এখানে উদ্ধৃত করা হল:

"ভবসিন্ধু যে অপার তাহে হয়ে কর্ণধার জীবগণের করিছেন নিস্তার॥ সজীবনে তারি নাম মোনে মনন অভিশ্রাম সংক্ষেপে কহিব কিছু না করি বিস্তার॥ ভক্তবৎসর গুন ভক্তিপথে জো নিপুণ মুক্তি দেন উক্তি আছে তার। শ্রীযুক্ত রামহরি নাম হৃদয় মুকুতে ধাম ত্রিজগতে তিনি সারত সার॥ সেই পদ সেবা করি সম্পদ বাসনা করি করিলাম পঞ্জিকা প্রকাষ। জোড়াসাঁকো মমঃ ধাম দিয দুর্গাপ্রসাদ নাম দুর্গাযদী পুরাণ অভিলাষ। নবদ্দিপের মতে মত তাহে নহেরন্যমত এমত জানিবে সকলে। জ্যাতো হেত্ত্ব যোগ বার আর যত আছে তার ভাষায় রচিলাম দেখে মূলে। গ্রহস্ত আশ্রমের ফল জানিতে হয় এ সকল ফলাফল যে গ্রহর যে দীনে। অন্নেসে কেয নাই পঞ্জিকা সকলের ঠাই দেখিবেন যখন হবে মনে। আর কীছু বলি ভুল যদী থাকে ইতে ভুল আমি করি মূলের প্রমাণে। আমার ভাষার ত্রূটি থাকে যদি কোটী ২ শুদ্ধ হবে সাধু সন্নিধানে।"

সঙ্কলকের এই নিবেদন থেকে বোঝা যায় যে পঞ্জিকাটির সঙ্কলক ছিলেন জোড়াসাঁকো নিবাসী ব্রাহ্মণ সন্তান দুর্গাপ্রসাদ। তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রামহরি নামক জনৈক ব্যক্তি। দুর্গাপ্রসাদ স্পষ্টই বলেছেন, তিনি সম্পদ লাভের আশায় এই পঞ্জিকা সঙ্কলন করেছেন। লঙ সাহেব বলেছেন, ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের পঞ্জিকা রামহরি নামক জনৈক ব্যক্তির দ্বারা প্রকাশিত। দুটি পঞ্জিকা একই পঞ্জিকা হতে পারে। প্রথমটি আমরা দেখিনি, তাই জোর করে কিছু বলা চলে না। দ্বিতীয় পঞ্জিকাটিতেও একটি ছবি আছে। এটি সূর্যগ্রহণের চিত্র।

'বিশ্বকোষ' থেকে জানা যায় কলকাতার স্যাণ্ডার্স কোম্পানী সর্বপ্রথম বাংলা পঞ্জিকা ছাপিয়ে প্রকাশ করে এবং তার সঙ্কলক ছিলেন হলধর বিদ্যানিধি। প্রথম প্রকাশের তারিখটি উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু আমরা এটির কোনো হদিস পাইনি। স্যাণ্ডার্স কোম্পানীর পঞ্জিকা অনেক পরে প্রকাশিত হয়েছে; তা দেখেছি।

এরপর থেকে প্রতি বৎসরই চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন পঞ্জিকা প্রকাশিত হতে থাকে। ১২২৭ সনে যে পঞ্জিকাটি প্রকাশিত হয় সেটি বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। এই পঞ্জিকাতে বৎসরের প্রথমে এবং প্রতি মাসের প্রথমে সংক্রান্তি ঠাকুরের ছবি দেওয়া আরম্ভ হয়। এই রীতি পরবর্তী অন্যান্য পঞ্জিকাতেও অনুসরণ করা হতে থাকে। আজও এই রীতি প্রচলিত আছে।

এ-পর্যন্ত প্রকাশিত পঞ্জিকার মধ্যে বোধহয় ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত পঞ্জিকাটি

আকারে সবচেয়ে বড়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৬৮। আর সবচেয়ে দামী পঞ্জিকা প্রকাশ করেন বিশ্বনাথ দেব, ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে, দাম এক টাকা। ঐ বছরে চন্দ্রিকা-প্রকাশিত পঞ্জিকার দাম ছিল বারো আনা।

ইতিপূর্বে উল্লিখিত 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র প্রবন্ধে বলা হয়েছে, ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দের মাত্র কয়েক বছর আগে মুদ্রিত পঞ্জিকার প্রচলন শুরু হয়। নদীয়ার অগ্রদ্বীপের নিকটবর্তী একটি গ্রামে গঙ্গাধর নামে জনৈক ব্যক্তি একটি পঞ্জিকা ছাপিয়ে প্রকাশ করেছিল। গ্রামাঞ্চলে পঞ্জিকা মুদ্রণের কথা এই প্রথম জানা যায়। এই পঞ্জিকাটি গঙ্গাধরের নিজস্ব মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু মুদ্রণের কোনো সন-তারিখ দেওয়া হয়নি। তবে ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই যে প্রকাশিত হয়েছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। পঞ্জিকাটি কৃষ্ণনগরের বিদ্যোৎসাহী রাজার নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। এই গঙ্গাধর কি গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের নামের বিকৃতি? গঙ্গাকিশোর নিজে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেছিলেন এবং তিনিই প্রথম বাঙালী, যিনি পুস্তক মুদ্রণ এবং বিক্রয়ের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

এরপরে উল্লেখযোগ্য পঞ্জিকা প্রকাশিত হয় ১২৩২ সনে (ইং ১৮২৫-২৬)। এতে জ্যোতিষ-বচনাদির আধিক্য দেখা যায়। এছাড়া নতুন সংযোজন হিসাবে আছে কোর্ট ফি, ডাকের মাশুল ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্যের সমাবেশ। অনেক বছর থেকেই কলকাতায় ইংরেজদের ব্যবহারের জন্য বার্ষিক ক্যালেণ্ডার বা 'অ্যালমানাক' প্রকাশিত হত। দিনপঞ্জী ছাড়া তাতে থাকত নানান প্রয়োজনীয় তথ্য। বাংলা পঞ্জিকার প্রকাশকেরা যে এদের আদর্শ অনুকরণ করে জ্যোতিষ বিষয়ের অতিরিক্ত তথ্য যোগ দিতে আরম্ভ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। এতে সাধারণ গৃহস্থের কাছে পঞ্জিকার মূল্য বেড়ে গিয়েছিল।

মূল পঞ্জিকার বহির্ভূত এইসব তথ্য থেকে সে যুগের অনেক বিষয় জানা যেতে পারে। ১২৩২ সনের পঞ্জিকায় ডাকমাশুলের যে তালিকা আছে তা কৌতূহলোদ্দীপক। তখন দূরত্ব অনুযায়ী চিঠির মাশুল নির্ধারিত হত। এক ভরি ওজনের চিঠির মাশুল কলকাতা থেকে ব্যারাকপুর, হুগলী, তমলুক প্রভৃতি স্থানের জন্য—দুই আনা, বীরভূম, খুলনা, মেদিনীপুর ইত্যাদির জন্য—চার আনা; কটক, ঢাকা বরিশাল ইত্যাদির জন্য—পাঁচ আনা; দিল্লি—এক টাকা; বোম্বাই—এক টাকা পাঁচ আনা, শিলংয়ের পথ দুর্গম হওয়ায় ঐ মাশুল দাঁড়িয়েছিল—আড়াই টাকায়।

১২৪২ সনের পঞ্জিকা অনেক দিক থেকেই উন্নত। এর প্রথম পৃষ্ঠা এরকম:

"The Bengalee Annual Almanac ॥ নূতন পঞ্জিকা ॥ শ্রীল শ্রীযুক্ত

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজানুমতা পঞ্জিকা॥ মহানাদ নিবাসি শ্রীযুক্ত গঙ্গাগোবিন্দ বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক শুভাশুভ দিনক্ষণ ভাষায় সংগৃহিত হইয়া॥ শ্রীপীতাম্বর সেন দীনসিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।"

পূর্বের পঞ্জিকাগুলোর চেয়ে এখানে মুদ্রণ-সৌষ্ঠব উন্নত ধরনের হয়েছে। জ্যোতিষ-সংক্রান্ত অনেক বেশি তথ্য পাওয়া যাবে। বারো মাসের বারোটি রাশির ফল এবং নূতন পঞ্জিকা শ্রবণের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। দেবদেবীর কয়েকটি ছবি এই পঞ্জিকার আর-একটি বৈশিষ্ট্য। পুরাণ ও ইতিহাসের মিশ্রণে ভারতবর্ষের যে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। এসব ছাড়া দৈনন্দিন প্রয়োজনের তথ্যাদিও আছে।

১২৪৩ সনের পঞ্জিকায় কোন্ হিন্দু পর্ব উপলক্ষে কদিন আপিস বন্ধ থাকত তার তালিকা পাওয়া যায়। সেটা এই: দশহরা—১; স্নানযাত্রা—১; রথযাত্রা—১; উল্টারথ—১; রাখীপূর্ণিমা—১; জন্মাষ্টমী—২; মহালয়া—১; দুর্গাপূজা—৮; শ্যামাপূজা—২; ভ্রাতৃদ্বিতীয়া—১, কার্তিকপূজা—২; জগদ্ধাত্রীপূজা—২; শ্রীপঞ্চমী—২; শিবরাত্রি—২. দোলযাত্রা—৩; বারুণীস্নান—১; চড়ক—১, মোট—৩২ দিন। ইংরেজদের ছুটি বছরে থাকত মাত্র চার দিন। মুসলমানদের ছুটি অনেক বেশি ছিল।

১২৫০ সনে কলকাতায় ছাপা যে পঞ্জিকা দেখা গেছে তার ছাপা নিকৃষ্ট শ্রেণীর হলেও এর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। বৈশিষ্ট্যটি হল, এই প্রথম পঞ্জিকায় বাংলা তারিখের পাশাপাশি আলাদাভাবে উড়িয়া ও হিন্দী তারিখ স্থান পেল।

১২৬১ সনের পঞ্জিকায় কলকাতার সম্মুখের গঙ্গায় জোয়ার-ভাটা নিরূপণের তালিকা এই প্রথম সন্নিবেশিত হয়। এখন পর্যন্ত তা চলে আসছে। এই পঞ্জিকা থেকে তৎকালীন পঞ্জিকার বিষয়বস্তু এবং তৎকালীন বাংলা ভাষার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভূমিকা থেকে একটু অংশ নমুনা হিসাবে দেওয়া গেল:

"স্বপক্ষ বিপক্ষ পক্ষপাত রহিত নিরপেক্ষ লক্ষ লক্ষ ছলগ্রাহি গুণগ্রাহি গুণিগণ সমক্ষে বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন এই যে স্তোকে স্তোকে শকে শকে নূতন নূতন প্রকাণ্ডালঙ্কারে ভূষিতা সুশোভিতা জনগণ মনোরঞ্জিকা পঞ্জিকা প্রকাশে প্রবর্ত্তমান হওয়া অস্বীকার না করিয়া বিহিত যত্নপূর্ব্বক নবদ্বীপের পঞ্জিকাকারকে আনাইয়া দিনপঞ্জিকা গ্রহস্ফুট নক্ষত্র সঞ্চার মহাসঞ্চার সময়াশুদ্ধি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া লগ্ন মুহূর্ত্তভুক্তি ভোগ্য দুর্গোৎসবাদি স্থলে আবশ্যকক্ষণ......" ইত্যাদি।

১২০০ সনের চারের দশকে শ্রীরামপুরের চন্দ্রোদয় প্রেস থেকে 'নূতন পঞ্জিকা'

প্রকাশিত হতে থাকে। এই মুদ্রাযন্ত্রের কর্ণধার ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার। তিনি একাধারে কুশলী হরফ-নির্মাতা, সুদক্ষ মুদ্রাকর, নিপুণ চিত্রশিল্পী ও ব্লক-নির্মাতা ছিলেন। সুতরাং তাঁর প্রকাশিত পঞ্জিকা ছিল সুমুদ্রিত, বহু সুন্দর চিত্রশোভিত। সেইসব চিত্র দেবদেবীর এবং বিবিধ উৎসব-অনুষ্ঠানের। মুদ্রণ-সৌষ্ঠব ও চিত্রসম্পদের দিক থেকে এই পঞ্জিকা এক নতুন যুগের সৃষ্টি করে। মুদ্রণ-সৌষ্ঠব ব্যতীত এই পঞ্জিকায় ছিল আদালত সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়, স্ট্যাম্পের মূল্য, ছুটির তালিকা, ডাকমাশুলের হার, কোম্পানীর টাকা ও সিক্কা টাকার বিনিময়ের হার ইত্যাদি।

কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর চন্দ্রোদয় প্রেসের পঞ্জিকার ঐতিহ্য গঙ্গাধর কর্মকার প্রমুখ ব্যক্তিরা অনেক বৎসর যাবৎ অব্যাহত রেখেছিল। ১২৯১ সন থেকে এই পঞ্জিকার অবনতি লক্ষ্য করা যায়। একই ব্লক বারবার ব্যবহার করায় ছবিগুলি অস্পষ্ট হয়ে গেছে। টাইপ ভিন্ন ধরনের। পুরনো সৌষ্ঠব আর দেখা যায় না।

বোধহয় চন্দ্রোদয় প্রেসের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে কলকাতার স্যাণ্ডার্স কোম্পানী পঞ্জিকা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিল। ছাপা ও ছবির ক্ষেত্রে তাদের প্রচেষ্টা ছিল কৃষ্ণচন্দ্রের অনুকরণ করা। এর চেয়ে উন্নত মানের পঞ্জিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যে তারা বিলেত থেকে ছবি ও বর্ডার আনাবার অর্ডার দিয়েছিল। তাদের নিজেদের কথা থেকেই এটা জানা যায়:

"বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণ লোকদিগের জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে আমরা এই পঞ্জিকার অনুষ্ঠান কালিন কহিয়াছিলাম যে শ্রীরামপুরের পঞ্জিকাপেক্ষা অতি মনোহর রূপে মুদ্রিত করিব, ইহা মনস্থ করিয়া ছবি, বার্ডর অর্থাৎ পৃষ্টার চতুষ্পার্শ্বের ফুল ও আর ২ দ্রব্যের নিমিত্ত বিলাতে পত্র লিখিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য বিলাত হইতে আসিবার অনেক বিলম্ব দেখিয়া বর্ত্তমান বৎসর এতদ্দেশীয় ছবি সকল গ্রহণ করিলাম। সংপ্রতি বিলাত হইতে ঐ সকল দ্রব্য এবং বিলাতি কাগজ আসিয়াছে তাহা আগামি বৎসরের পঞ্জিকায় মুদ্রিত করা যাইবেক॥"

এই বিজ্ঞাপনটি আছে ১২৫৪ সনের (ইং ১৮৪৭-৪৮) পঞ্জিকায়। পঞ্জিকাটি ২০২ পৃষ্ঠার। নবদ্বীপাধিপতির অনুজ্ঞায় এটি সঙ্কলিত। এই পঞ্জিকায় আছে, "সম্বৎ বাঙ্গালা ও ইংরাজী প্রচলিত বহুদিনের সহিত ঐক্য করিয়া প্রতিদিবসীয় তিথ্যাদি জ্ঞানার্থ নিরূপণ করিয়া প্রাত্যহিক লগ্ন মুহূর্ত্ত ভূক্তি, এবং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য সম্মত শুভক্ষণ শ্রাদ্ধ দিনাদি নির্ণয়পূর্ব্বক ও খোনার নানা প্রকার বচন সংগ্রহ করিয়া এবং হরিভক্তিবিলাসের মত একাদশী, ব্যবস্থা, ইত্যাদি……।"

পঞ্জিকাটি চিত্রশোভিত। ছবিগুলি নতুন করে আঁকানো, অনেকটা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুকরণে।

পঞ্জিকার ব্যবসা লাভজনক না হলে বিলেত থেকে ছবি এবং অলঙ্করণের সামগ্রী আনার ব্যবস্থা করা হত না। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে এই কোম্পানী বহু চিত্রশোভিত ৩০৪ পৃষ্ঠার পঞ্জিকা পাইকারি সাত আনা হিসাবে বিশ হাজার কপি বিক্রি করেছিল।

১৮২৫-৩০ খ্রীস্টাব্দে যে-পঞ্জিকার দাম ছিল এক টাকা, ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে তার দাম দাঁড়িয়েছিল দু'আনায়। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে শুধু কলকাতার বাজারে এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার পঞ্জিকা বিক্রি হয়েছে বলে লঙ সাহেব প্রমাণ পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অনুমান, প্রমাণের বাইরে অনেক বেশি বিক্রি হয়েছে—যার সংখ্যা আড়াই লক্ষের কম নয়। পঞ্জিকার এত বিক্রির কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন যে, পান-তামাকের মতই বাঙালীর জীবনে পঞ্জিকা অপরিহার্য ছিল।

তখন কলকাতায় কোনো বাংলা বইয়ের দোকান ছিল না। পঞ্জিকা বিক্রি হত ছাপাখানা থেকেই। নতুন বৎসর আরম্ভ হওয়ার কিছুদিন আগে থেকেই মুটেরা ঝাঁকায় ভর্তি করে পঞ্জিকা নিয়ে পথে পথে ফিরি করে বেড়াত। ঝাঁকা ফুরোতে বেশি দেরি হত না।

১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে প্যারিস আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে যেসব বাংলা বই পাঠানো হয়েছিল তার মধ্যে বারোটি পঞ্জিকা ছিল। কোনোটির দাম বারো আনার বেশি ছিল না। সবচেয়ে সস্তা ৫৬ পৃষ্ঠার পঞ্জিকার দাম ছিল দু'আনা। বিশ্ববিনোদ প্রেসের ৩০১ পৃষ্ঠার পঞ্জিকার দাম ছিল বারো আনা। এই পঞ্জিকায় রেলপথের ছবি এবং রেলের সময়-সারণী থাকায় বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

হিন্দু সমাজে পঞ্জিকার বহুল প্রচলন দেখে খ্রীস্টান সমাজের ব্যবহারের জন্য কলকাতার ট্র্যাক্ট সোসাইটি ও চার্চ অব ইংলণ্ডের যৌথ উদ্যোগে ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে একটি খ্রীষ্টীয় পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই পঞ্জিকা বেশিদিন চলেনি।

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রুচিসম্মত পঞ্জিকা প্রকাশ করেছিল 'ভার্নাকুলার লিটারেচার কমিটি'। পরপর দু'বৎসর—১২৬১ (ইং ১৮৫৫-৫৬) ও ১২৬৩ (ইং ১৮৫৬-৫৭)-তে এই পঞ্জিকা বের হয়। এদের ছাপা পরিচ্ছন্ন, কাগজ ভাল, বিবিধ তথ্যে পূর্ণ। কিন্তু দেবদেবীর ছবির আধিক্য এবং হিন্দুর নানাবিধ সংস্কার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ছিল না বলে জনপ্রিয় হতে পারেনি। ২০০ পৃষ্ঠার এই পঞ্জিকার দাম ছিল মাত্র চার আনা। প্রথম বছর আড়াই হাজার কপি বিক্রি

হলেও পরের বছরে তা কমে দাঁড়ায় মাত্র ৪১৯ কপিতে। এরই জন্য পঞ্জিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল।

প্রথম বছরের এই পঞ্জিকার ছিল দুটি ভাগ। প্রথম ভাগে আসল দিনপঞ্জী এবং এই বিষয়গুলি ছিল: ১৮৫৫-৫৬ খ্রীস্টাব্দে বিভিন্ন রাজস্ব এলাকায় লাটের খাজনা দাখিলের শেষদিন; ছুটির তালিকা। এই তালিকা থেকে জানা যায় ঐ বছর হিন্দু পর্বে ৩৬ দিন, ইংরাজদের পর্বে ৪ দিন এবং মুসলমান পর্বে ৪৭ দিন আপিস বন্ধ ছিল। রমজান মাসটা সম্পূর্ণ ছুটি থাকত দেখা যায়। আর ছিল সুপ্রীম কোর্টের টার্ম ও সিটিং আরম্ভের তারিখ।

দ্বিতীয় ভাগের পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রথম ভাগের তুলনায় অনেক বেশি এবং তা অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। এই অংশটি সে-যুগের বাংলার অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ মূল্যবান।

দ্বিতীয় ভাগের প্রথমেই আছে বাংলার ৩০৯টি প্রসিদ্ধ মেলার জেলাওয়ারি বিবরণ। জেলার সদর থেকে মেলার স্থানটির দূরত্ব, কোন্ তারিখে কি উপলক্ষে মেলা বসে এবং মেলায় কোন্ কোন্ জিনিসের আমদানী হয় তার বিবরণ আছে। দেখা যায় উত্তরবঙ্গের অনেক মেলায় হাতি-ঘোড়া প্রভৃতির আমদানী হত। ভবানীপুর ও খিদিরপুরের মেলা কাপড়, পুতুল ও মিষ্টান্নের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। অধিকাংশ মেলার সময় ছিল বৈশাখ মাস। তালিকা থেকে দেখা যায় ত্রিপুরা জেলায় মেলার আধিক্য সবচেয়ে বেশি।

এরপরে আছে মাসিক কৃষিকার্যের বিবরণ। কোন্ মাসে কি কি শস্যের চাষ করতে হবে সে সম্বন্ধে নির্দেশ। কোম্পানী ও সিক্কা টাকার বিনিময় হারের তালিকা থেকে দেখা যায়—তখনকার সিক্কা পনেরো আনায় কোম্পানীর এক টাকা; অথবা কোম্পানীর একশ টাকায় সিক্কা তিরানব্বই টাকা বারো আনা।

মুন্সেফ ও উকিল-পদপ্রার্থীদের জন্য বিস্তৃত বিবরণ সংবলিত প্রসপেক্টাস আছে। আবেদনকারী কি ফরমে দরখাস্ত করবে তার নমুনাও আছে সেই সঙ্গে। মৌখিক ও লিখিত এই দু'রকম পরীক্ষাই দিতে হত। লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থীর যে-কোনো ভাষা ব্যবহার করবার স্বাধীনতা ছিল।

আদালত-সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য তথ্যের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে রবিবার, বড়দিন, গুডফ্রাইডে এবং হিন্দুদের জন্য দুর্গাপূজার সপ্তমী থেকে দশমী এই চারদিন আদালতের কোনো হুকুম বা সমন জারি হত না।

১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের ১৭ নং আইন অনুযায়ী ডাক বিভাগের যে আমূল পরিবর্তন

হয় তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ঐ বছর থেকে ডাকবিভাগের দুর্নীতি দূর করবার জন্য ব্যবস্থা করা হয় যে, প্রেরক চিঠির উপর টিকিট লাগিয়ে দেবে। আগে নগদ পয়সা জমা দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। ঐ বছর থেকে কোম্পানীর রাজত্বের সর্বত্র একরকম মাশুল নির্ধারিত হয়। দূরত্ব অনুসারে মাশুল নির্ণয়ের প্রথা রহিত হয়ে গেল।

রেল সম্বন্ধে, যাত্রীদের কর্তব্য সম্বন্ধেও অনেক তথ্য রয়েছে। তখন হাওড়া থেকে রানীগঞ্জ পর্যন্ত লাইন খোলা হয়েছে। হাওড়া থেকে সকাল সাড়ে ন'টায় গাড়ি ছেড়ে রানীগঞ্জ পৌঁছত বিকেল সাড়ে চারটেয়। হাওড়া থেকে বর্ধমান পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ছিল এক টাকা, রানীগঞ্জের ভাড়া এক টাকা চোদ্দ আনা। রবিবার রেলগাড়ি চলাচল বন্ধ থাকত। স্টেশনের বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে 'আড্ডা'। (এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে সমসাময়িক অপর-এক পঞ্জিকায় দেখেছি কলকাতা থেকে ক্যানিং লাইনের গাড়িতে চারটে শ্রেণী ছিল। শেয়ালদা থেকে বালীগঞ্জের ভাড়া ছিল চতুর্থ শ্রেণীতে এক আনা এবং তৃতীয় শ্রেণীতে পাঁচ পয়সা।)

তারপরে আছে বাংলার বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত নানা প্রকার ওজন ও মাপের আর্যা। বাংলার আঞ্চলিক রাজস্ব এলাকা এবং মহকুমা ও থানা এলাকার নির্দেশ সে-সময়কার ভৌগোলিক বিন্যাস বুঝতে সহায়তা করবে।

ভারতবর্ষীয় প্রধান প্রধান রোগের বিবরণ এবং তাদের প্রতিকারের ব্যবস্থা আলোচনা করা হয়েছে গৃহস্থদের উপকারের জন্য। মাথাব্যথা ও পেটব্যথায় জোঁক লাগাবার ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। হাত-পা মচকালে বেদনার তারতম্য অনুসারে ছয়টা থেকে আটটা জোঁক লাগাবার উপদেশ আছে।

বাংলাদেশের (বর্তমান বিহার ও উড়িষ্যার অংশ-সহ) ডেপুটি কালেক্টার ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের নাম, বেতন এবং কতদিন যাবৎ চাকরি করছেন তার বিবরণ পাওয়া যাবে এই পঞ্জিকায়। অনেকটা 'সিভিল লিস্ট'-এর মত। সেকালের বিরাট আয়তন বাংলার শাসন পরিচালনার জন্য ডেপুটি কালেক্টার ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মোট ছিলেন ১০৮ জন। তাঁদের শ্রেণীবিভাগ এইরূপ: প্রথম শ্রেণী—১, দ্বিতীয় শ্রেণী—৯, তৃতীয় শ্রেণী—১৫, চতুর্থ শ্রেণী—২০, পঞ্চম শ্রেণী—২৫, ষষ্ঠ শ্রেণী—৩১ এবং অতিরিক্ত ৭ জন। প্রথম শ্রেণীর ডেপুটি কালেক্টার ছিলেন বাঙালী, বেতন ৭৫০ টাকা। অন্যান্য শ্রেণীতে অনেক ইংরেজের নাম আছে। একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, বর্তমানের মত উচ্চতম ও নিম্নতম শ্রেণীর মধ্যে বেতনের পার্থক্যটা প্রকট হয়ে ওঠেনি। শ্রেণীতে শ্রেণীতে বেতনের কম-বেশি পার্থক্য।

এরপর থেকে বাংলা পঞ্জিকার আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়।

যে কয়টি বাংলা পঞ্জিকা শতাধিক বৎসর যাবৎ প্রচলিত আছে তাদের মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে প্রাচীন 'গুপ্তপ্রেস ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা'। প্রতিষ্ঠিত হয় ১২৭৬ সনে। প্রতিষ্ঠাতা দুর্গাচরণ গুপ্ত। বোধহয় প্রথমে এই পঞ্জিকা পকেট সাইজে প্রকাশিত হত। ছবি এবং ছাপা কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকারের পঞ্জিকার মত উৎকৃষ্ট ছিল না।

সম্ভবত ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে প্রথম পি. এম. বাক্‌চি পঞ্জিকা বের হল দু'খণ্ডে। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কিশোরীমোহন বাক্‌চি। পঞ্জিকা ছাডা একটি ভাগে থাকত নানা তথ্যসমৃদ্ধ 'ডাইরেক্টরী'। এখন যদিও ডাইরেক্টরী বের হয় না, তবুও পঞ্জিকার নামের সঙ্গে ডাইরেক্টরী কথাটি যুক্ত রয়ে গেছে। এই ডাইরেক্টরী সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব।

গুপ্তপ্রেস ও পি. এম. বাক্‌চি-র প্রকাশকরা পঞ্জিকা ছাড়া অন্য অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন।

এই দুটি পঞ্জিকা বহুল-প্রচারিত হলেও কেউ কেউ একটি দৃকসিদ্ধান্ত পঞ্জিকার অভাব অনুভব করেন। সেই অভাব পূরণের জন্য ১২৯৭ সন থেকে 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা'র প্রকাশ আরম্ভ হয়। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রচলিত কোনো কোনো পঞ্জিকায় মুসলমানদের সন, মাস, তারিখ এবং পর্ব ইত্যাদি থাকে; কিন্তু এইটুকুতে মুসলমান সমাজের চাহিদা মেটে না। তাই বাংলা ১২৯৯ সনে মুসলমানী পঞ্জিকা বা 'বৃহৎ মহম্মদীয় পঞ্জিকা' প্রকাশিত হয়। ১৩১৪ এবং ১৩২০ সনের পঞ্জিকা-দুটি দেখবার সুযোগ হয়েছে। ১৩১৪ সনের পঞ্জিকাটির তিনটি ভাগ মিলিয়ে মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৭২। প্রথম ভাগে মূল পঞ্জিকা। দ্বিতীয় ভাগে হিন্দুদের জ্ঞাতব্য বিষয়। তৃতীয় ভাগে ডাইরেক্টরী, সেখানে আছে পৃথিবীর মুসলমান রাজ্য ও সাম্রাজ্যাদির বিবরণ এবং শেষে ষ্টিমার সার্ভিসের টাইম টেবল।

১৩২০ সনের 'বৃহৎ মহম্মদীয় পঞ্জিকা'র সঙ্কলকের নাম জানা গেছে, তা হল মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ। এর দাম কলকাতার জন্য নয় আনা ও মফস্বলের জন্য চার আনা। এটিও তিন ভাগে বিভক্ত। ভূমিকায় সঙ্কলক বলেছেন:

"হে পরম কারুণিক দয়াময় আল্লাহ তা-লা! তোমার সৃজিত দিন-রাত্রি, ঋতু-পক্ষ, মাস-তিথি ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় এবং তোমার উপাসনা ও আরাধনার নিয়ম পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। মুসলমানগণ পৌত্তলিকতা-মূলক পঞ্জিকাদি *ব্যবহার করিতেছে, ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তোমার আদেশের*

বিপরীতাচরণ করিতেছে ; এ ক্ষুদ্র দীন-হীন অকিঞ্চন তাহাদিগকে সেই ভ্রান্ত মত হইতে—তোমার অভিলষিত ও অনুমোদিত ন্যায়পথ প্রদর্শন জন্য, এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল ; অতএব তুমি এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে বল প্রদান কর। তোমা ব্যতীত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। এই পুস্তকে যদি ভ্রম থাকে, কোনও ধর্ম্ম-বিগর্হিত কথা সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে, তোমার এ দীন অভাজন "বান্দা"কে তজ্জন্য ক্ষমা করিবে।"

এরপরে হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে হয়ত সঙ্কলক তাঁর অন্যায় ক্ষালন করতে চেয়েছেন। অথচ এই পঞ্জিকাতেই হিন্দুদের কিছু কিছু পর্বাদির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইংরেজরা বাংলার শাসনভার গ্রহণ করে পঞ্জিকার বিভিন্নতা নিয়ে যে সমস্যায় পড়েছিল, স্বাধীনতা লাভের পরে ভারত সরকারকেও সেই সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অব্দের বৈচিত্র্য এবং তারিখের বিভিন্নতা জটিল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। এর সমাধানের উদ্দেশ্যে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ মেঘনাদ সাহাকে সভাপতি করে একটি পঞ্জিকা সংস্কার কমিটি গঠন করা হয় ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে। তিন বৎসর পরে কমিটি রিপোর্ট পেশ করে। এর নানাবিধ সুপারিশের মধ্যে প্রধান হল অন্য সব অব্দকে বাদ দিয়ে শকাব্দকে স্বীকৃতি দেওয়া। এছাড়া আদর্শ পঞ্জিকা হিসাবে 'রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ' প্রকাশের পরামর্শও কমিটি সরকারকে দেয়। সেই অনুসারে ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে বারোটি ভারতীয় ভাষায় বিশুদ্ধ গণনা সংবলিত এবং সর্বপ্রকার বাহুল্য-বর্জিত 'রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ' প্রকাশিত হচ্ছে।

পঞ্জিকার আদিপর্বে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পঞ্জিকার নাম থাকত 'নূতন পঞ্জিকা'। সঙ্কলক ও প্রকাশকের নাম দিয়ে তাদের পার্থক্য নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীকালে অনেক প্রকাশকই প্রতিষ্ঠাতা বা প্রকাশকের নাম অনুসারে পঞ্জিকার নামকরণ করেছে। আবার কেউ কেউ রাজভক্তির নিদর্শন হিসাবে 'ভিক্টোরিয়া পঞ্জিকা' (১২৯৭), 'লর্ড রিপন পঞ্জিকা' (১২৯৩) প্রভৃতি নামকরণ করতেন।

পূর্বে জ্যোতিষ বচনাদির প্রাধান্য এখনকার মত ছিল না। যতদূর জানা যায় উপরোক্ত ভিক্টোরিয়া পঞ্জিকাতেই প্রথম ব্যক্তিগত রাশিফল সংযোজিত হয়। এখন সব পঞ্জিকাতেই ব্যক্তিগত রাশি ও লগ্নফল দেওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক সচেতনার সঙ্গে সঙ্গে অনেক পরবর্তীকালে রাষ্ট্রগত বর্ষফলও দেওয়া আরম্ভ হয়েছে। শুধু ভারতের নয়, পৃথিবীর সকল প্রধান দেশেরও ফলাফল দেওয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া অনেক পঞ্জিকায় ব্যক্তিগত কোষ্ঠী-বিচারের জন্য ফলিত

জ্যোতিষের প্রয়োজনীয় অংশ সন্নিবেশিত করা হয়। কোনো কোনো পঞ্জিকায় হিন্দুর পূজা ও উৎসব-অনুষ্ঠানের মন্ত্র উপচার এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বন্ধে বিবরণ দেওয়া থাকে। কয়েক বৎসর যাবৎ দৈনিক তিথি-নক্ষত্রাদির সঙ্গে সেই বিশেষ দিনটিতে কোনো বিশেষ মহাপুরুষের আবির্ভাব কিংবা তিরোভাবের কথাও উল্লেখ করা হয়। এমনকি একটি পঞ্জিকায় শিক্ষক দিবসের উল্লেখও দেখা গেছে।

জ্যোতিষ-গণনার অতিরিক্ত অনেক তথ্য যে পঞ্জিকায় সন্নিবেশিত করা হত, তার কিছু কিছু পরিচয় আমরা পূর্বে দিয়েছি। জনসাধারণের নিকট যাতে প্রকাশনটি অধিকতর প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই এইসব পঞ্জিকা-বহির্ভূত তথ্য দেওয়া হত। যেমন, ১২৭৭ সনের 'নূতন পঞ্জিকা'য় (চন্দ্রোদয় প্রেস) রেলের নিয়মে দেখা যায়—গাড়িতে বা স্টেশনে ধূমপান নিষিদ্ধ ; করলে কুড়ি টাকা জরিমানা।

ইংরেজীতে তখন নানাবিধ বর্ষপঞ্জী বের হত। গত শতকের ষাটের দশক থেকে প্রকাশিত হত থ্যাকার কোম্পানীর 'ক্যালকাটা ডাইরেক্টরী'। বাংলায় অনুরূপ কোনো বর্ষপঞ্জী ছিল না বলে এইসব তথ্য সাধারণ গৃহস্থের নিকট ছিল মূল্যবান সংযোজন।

বিগত শতকের শেষভাগে অন্য পঞ্জিকার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়ী হবার উদ্দেশ্যে এত বেশি পরিমাণ অতিরিক্ত তথ্য যুক্ত করতে আরম্ভ করল কেউ কেউ যে, মূল পঞ্জিকায় স্থান-সঙ্কুলান হল না। এজন্য একটি আলাদা ডাইরেক্টরী অংশ করতে হল। গুপ্তপ্রেস, ভিক্টোরিয়া, মহম্মদীয় প্রভৃতি পঞ্জিকার ডাইরেক্টরী অংশ ছিল জানা যায়। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পি. এম. বাক্‌চির ডাইরেক্টরী। এটি কয়েক বছর পৃথক বই হিসাবে বেরিয়েছে। একটি ডাইরেক্টরী দেখেছি, কিন্তু কোন্ বছরের এবং দাম কত তা বলা যায় না। কারণ নামপত্র ও প্রচ্ছদপত্র নেই। বোধহয় ১৮৯৯ বা ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ডাইরেক্টরী। লর্ড ও লেডি কার্জনের ছবি আছে। কার্জন কলকাতা আসেন ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। নতুন আগমন উপলক্ষেই ছবি ছাপা হওয়া স্বাভাবিক।

এই ডাইরেক্টরীতে এত বিষয়ের তথ্য আছে যে তখনকার দিনে এতসব সংগ্রহ করা আশ্চর্যের বিষয় মনে হয়। প্রথম ভাগেই দেওয়া হয়েছে ব্রহ্মদেশ থেকে এডেন পর্যন্ত ভারত সাম্রাজ্যের প্রতিটি প্রদেশের বিস্তৃত বিবরণ। প্রশাসনিক কর্মচারীদের পদমর্যাদা ও বেতন-সহ নাম। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুলিশ, জেল ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগের কথা বিস্তৃতভাবে দেওয়া হয়েছে। এই অংশ থেকে তৎকালীন বাংলাদেশের প্রতিটি

জেলার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে। আর দেখা যাবে সে-যুগের বাঙালীরা কত দূরদেশে গিয়ে সরকারী চাকরি করত। রয়েল সাইজের বইটির প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠা এই অংশটির জন্য দেওয়া হয়েছে। এরপরে আছে প্রায় ৪৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী কলকাতার স্ট্রিট ডাইরেক্টরী। রাস্তার কত নম্বর বাড়ির বাসিন্দা কে ছিল বা কোনো দোকান বা অন্য প্রতিষ্ঠান ছিল কিনা তারও বিবরণ পাওয়া যাবে। দেখা যায়, তখন কলেজ স্ট্রিট এবং কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটেও বেশ্যালয় ছিল। তারপর রয়েছে যান-ডাইরেক্টরি "অর্থাৎ ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ, গ্রাম বা নগরাদিতে যাতায়াতের উপায় প্রদর্শিকা।" এরপর 'কলিকাতা আইন-ডাইরেক্টরী' অংশে মহামান্য হাইকোর্ট এবং স্মলকজ কোর্ট (ছোট আদালত)-এর বিচারপতি, উকিল, কর্মচারীদের নামধাম ও আনুষঙ্গিক তথ্যাবলী। তাছাড়া পোস্টাল বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, কলকাতার বিভিন্ন ব্যবসায় ও ব্যবসায়ীদের নাম-ঠিকানা, কলকাতার প্রধান প্রধান সরকারী অফিসের ও সওদাগরী অফিসের নানান বিবরণ, যাত্রা ও থিয়েটারের বিবরণ, বিভিন্ন সভা-সমিতি ও পাঠাগারের নামধাম, হাসপাতাল ও দাতব্য সভার বিবরণ, জিমনাস্টিক পার্টি, কনসার্ট পার্টি, ব্যাঙ্ক ও চিকিৎসকদের এবং জ্যোতিষীদের নাম-ঠিকানাও আছে। কলকাতার স্কুল-কলেজের তালিকা ও শিক্ষকদের নামসমূহ একটি আকর্ষণীয় সংযোজন।

বর্তমানে পঞ্জিকার সঙ্গে এইসব প্রয়োজনীয় তথ্য আর দেওয়া হয় না, অথচ এর প্রয়োজন এখনও সাধারণ পাঠকের কাছে নিশ্চয়ই আছে। কারণ তথ্যসমৃদ্ধ বাংলা রেফারেন্স বই বেশি নেই। তবে মূল পঞ্জিকায় ধর্মচর্যা সম্বন্ধে এমন সব তথ্য দেওয়া হয়ে থাকে যা অন্য কোনো একটি পুস্তকে পাওয়া সম্ভব নয়। কাগজ ও মুদ্রণের ব্যয় এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, পঞ্জিকার সঙ্গে অতিরিক্ত অন্য কিছু যোগ করলে দাম বেড়ে সাধারণ ক্রেতার নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা।

পঞ্জিকার মূল্য যে শুধু ধর্মজীবনে নিবদ্ধ নয়, তা এর সমগ্র ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই উপলব্ধি করা যায়। পঞ্জিকার আদিপর্বে অন্য কোনো বাংলা বই এত বেশি সংখ্যায় বিক্রি হত না। সেইজন্য মুদ্রণ-পারিপাট্যে, প্রকাশনায় এবং পুস্তক ব্যবসায়ে পঞ্জিকার দান গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্জিকার বিক্রি এবং তা থেকে লাভের সম্ভাবনা দেখেই অনেকে বইয়ের ব্যবসায়ে নেমেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে গত শতকের শেষার্ধে অনেক পঞ্জিকা-প্রকাশক পুস্তক প্রকাশেও উদ্যোগী হয়েছিলেন।

আরও দুটি কারণে পঞ্জিকার দান বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। পঞ্জিকাতেই বাঙালী শিল্পীর ছবি আঁকা ও ছাপার কাজ প্রথম ব্যাপকভাবে শুরু হয় বলা যায়।

এই ছবি মোটামুটি দুরকম: প্রথমত, পঞ্জিকার প্রয়োজনে দেবদেবী ও রাশিচক্র ইত্যাদির ছবি। দেবদেবীর ছবি একই ধাঁচে চলে আসছে দেড় শতাধিক বৎসর যাবৎ। সার্বজনীন পূজায় দুর্গামূর্তির পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু পঞ্জিকার ছবিতে সেই দুর্গা একইরকম আছেন। একই ব্লক বারবার ছাপা হয়ে অনেক সময় অস্পষ্ট দেখালেও প্রথম দিকের পঞ্জিকায় ছবিগুলি স্পষ্ট, সুন্দর ও বলিষ্ঠ। কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকারের খোদাই করা বলিষ্ঠ রেখার ছবিগুলির কমনীয়তা আজও দৃষ্টিনন্দন। ছবি আঁকা এবং নিপুণভাবে কাঠে খোদাই করা, কাঠে ব্লক তৈরি করা এবং ছাপা সবই কুশলী হাতের কাজ। কাঠেরও যে এত রূপ—তা এই ছবিগুলি থেকে উপলব্ধি করা যায়।

দ্বিতীয়ত, ছিল বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ছাপা ছবি। প্রথমদিকে বিজ্ঞাপন থাকত সামান্য এবং পরে ধীরে ধীরে যখন বিজ্ঞাপন যুক্ত হল তখনও সচিত্র বিজ্ঞাপন কমই দেখা যায়। অনেক পরে অবশ্য কোনো কোনো পঞ্জিকায় বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ছবি ভাল করেই আঁকা হত। কিন্তু দেবদেবীর ছবি আঁকার মত শিল্পীর প্রেরণা প্রথমদিকের বিজ্ঞাপনের ছবিতে ছিল না বলেই মনে হয়।

এছাড়া সমসাময়িক ঘটনাও পঞ্জিকাকারদের মনে যে প্রভাব বিস্তার করত তারও কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, প্রাম যখন হাওড়া থেকে আসানসোল পর্যন্ত রেল চলাচল শুরু হল তখন রেলগাড়ি জনচিত্ত আলোড়িত করেছিল। তারই ফলে কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার রেলগাড়ির একটি সুন্দর ছবি এঁকে ব্লক ছাপিয়েছিলেন তাঁর চন্দ্রোদয় প্রেসের পঞ্জিকায়। এই ছবিটি বহু বৎসর যাবৎ ছাপা হয়েছে।

তারপর আর-একটি ঘটনা। গড়ের মাঠে ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে বেলুনে চড়ে এক সাহেব প্যারাশুট ছাড়াই গিয়ে নেমেছিলেন বসিরহাটে। তারপরে প্রথমে বেলুনে চড়েছিলেন এক বাঙালী. এই ঘটনাটিও সেদিন বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং নৃত্যলাল শীলের পঞ্জিকায় (১২৯৮) বেলুনের একটি ছবি দিয়ে সংবাদটি ছাপা হয়েছিল। সেটি এরকম:

"বেলুনবিহার যন্ত্র।

স্পেন্সার সাহেবের অদ্ভুত বেলুনে উড্ডিয়মান ১৮৮৯ সালে গার্ণিভেল সাহেব এই প্রথম কলিকাতায় আগমন করিয়া গড়ের মাঠে প্রথমবার বেলুনে উড্ডিয়মান হইয়া বিনা পেরাশুটে বসিরহাটে অবতরণ করেন। ২য় বার চিৎপুরে বেলুনে উঠিয়া পেরাশুট অবলম্বন করিয়া অতি আশ্চর্য্য রূপে অবতরণ করিয়াছিলেন এবং ৩য় বারে ভারতবর্ষে এই প্রথম বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র চট্টো উঠিয়াছিলেন।"

পণ্যপ্রচারে বাংলার নিজস্ব রীতি পঞ্জিকার পৃষ্ঠাতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। পঞ্জিকা প্রায় ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা লাভ করে বলে অবাধে সকল পরিবারেই প্রবেশ করতে পারে। সেই সঙ্গে বিজ্ঞাপনেরও অবাধ প্রবেশাধিকার মেলে। তবে পাঠক-পাঠিকারা সাধারণ শিক্ষিত নরনারী। এদিকে লক্ষ্য রেখে বিজ্ঞাপনের ভাব, ভাষা এবং বিষয়বস্তু ঠিক করা হত। তাদের সহজে লুব্ধ করবার উদ্দেশ্যে নানারকম ম্যাজিক, সম্মোহন, গুপ্তবিদ্যা, গুপ্তরোগের ঔষধ, দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য কবচ ও ঔষধ ইত্যাদির কথা পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনে দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচারিত হয়েছে। এইসব বিজ্ঞাপনের সহায়তায় একদল ব্যবসায়ীর ব্যবসা মফস্বলে ভালই চলত। বর্তমানে এই ধরনের বিজ্ঞাপন খুবই অল্প দেখা যায়। এখন সুপ্রচলিত পঞ্জিকায় জ্যোতিষী এবং গ্রহশান্তির জন্য রত্ন ইত্যাদির বিজ্ঞাপনের প্রাধান্য। কিছু কিছু সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীও পঞ্জিকাকে পণ্যপ্রচারের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছে।

গত শতকের একটি উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞাপন দেখা যায় শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় প্রেসের 'নূতন পঞ্জিকা'য় (১২৭১)। সেটি এরকম :

"উত্তমাক্ষরের বিজ্ঞাপন।

ভারতবর্ষ বিখ্যাত ৺কৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মকারের খোদিত অক্ষর যে সকল সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাহার আর পরিচয় দিবার অপেক্ষা নাই। উক্ত সুবিখ্যাত শিল্পকারের নামমাত্র শ্রবণে সকলেই অক্ষরের গুণাগুণ জ্ঞাত হইতে পারিবেন ফলত তদ্দারা খোদিত বাঙ্গালা ও দেবনাগরের ছেনি সকল অতুল্যরূপে বিখ্যাত আছে সেই ছেনির অক্ষর উত্তমরূপে ঢালিত নানা প্রকার বাঙ্গালা ও দেবনাগর অক্ষর সকল শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় যন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীগঙ্গাধর কর্ম্মকারের বাটিতে প্রস্তুত আছে যাঁহার আবশ্যক হইবে উক্ত যন্ত্রালয়ে সংবাদ পাঠাইলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

বাঙ্গালা	দেবনাগর
গ্রেট	গ্রেট
পাইকার	পাইকার
এস্মল পাইকার	এস্মল পাইকার"
লং প্রাইমার	
বরজাইস্	

বিজ্ঞাপনে শিল্পীর অংশগ্রহণের সুযোগ কম। অধিকাংশ বিজ্ঞাপনই

চিত্রবিহীন। বর্তমানে ফটোগ্রাফ থেকে কিছু কিছু ব্লক দেওয়া হয়; অন্যত্র হেডপিস, পণ্যের ছবি বা নারীমূর্তি দেখা যায়। উনবিংশ শতকের শেষভাগে কিছু কিছু বিজ্ঞাপন শিল্পীর সহায়তায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। এমনকি বিজ্ঞাপনে কার্টুনেরও ব্যবহার হত। দেশীয় প্রথায় সহজবোধ্য ভাষায় পণ্যকে জনসাধারণের নিকট পরিচিত করে দেবার ব্যবস্থা পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনই প্রথম করেছিল।

প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা পঞ্জিকার মূল অংশ, ডাইরেক্টরী বিভাগ এবং বিজ্ঞাপনের পাতাগুলি পাঠ করলে ধর্ম, সংস্কৃতি ও বাণিজ্যিক বিবর্তনের একটা সূত্র পাওয়া যেতে পারে।*

* এশিয়াটিক সোসাইটি, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পঞ্জিকা-সংগ্রহের উপর ভিত্তি করে প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

প্রথম বিদেশী নীলকর

পলাশীর যুদ্ধের বছর বিশেক পরেই ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে নীল চাষের উন্নতি ও প্রসারের দিকে দৃষ্টি দেয়। য়ুরোপীয়ানরা নতুন পদ্ধতিতে নীল চাষ শুরু করবার কয়েক দশক পর থেকে কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষের সূত্রপাত হয়। ব্রিটিশ আমলে নীল চাষকে কেন্দ্র করে এত আন্দোলন হয়েছে যে আমাদের অনেকেরই ধারণা—বুঝি ইংরেজরাই এদেশে প্রথম নীলের চাষ প্রবর্তন করেছে।

প্রাচীনকালেও ভারতে নীলের চাষ হত এবং বিদেশে আমাদের নীলের বেশ চাহিদা ছিল। তবে নীল সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্যে বিশেষ কোনো আলোচনা নেই। প্রাচীন চিত্র থেকে নীলের ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। রোমের বিজ্ঞানী প্লিনি (২৩-৭৯ খ্রীস্টাব্দ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ন্যাচারাল হিস্ট্রি'-তে নীলের উল্লেখ করেছেন। নীল ভাল কিনা আগুনে দিয়ে তা পরীক্ষা করবার কথাও বলেছেন তিনি। প্লিনির বইয়ে নীলের নাম পাই 'ইণ্ডিকাম'। বর্তমান 'ইণ্ডিগো' এবং পুরনো 'ইণ্ডিকাম' থেকে প্রমাণিত হয় যে ভারতেই নীল তৈরির সূত্রপাত হয়েছিল এবং ভারত য়ুরোপে নীল রপ্তানী করত।

মোগল যুগে গুজরাটের নীল রপ্তানী হত য়ুরোপে। এর সমর্থন পাওয়া যায় 'আইন-ই-আকবরী'তে। গুজরাটে উৎপন্ন নীলের মান ছিল উন্নত। কিন্তু সে-সময় সর্বোৎকৃষ্ট নীল তৈরি হত আগ্রার নিকটবর্তী বিয়ানা অঞ্চলে। এই নীলের দাম ছিল ষোলো টাকা মন। বার্নিয়ারের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে নীল চাষের উল্লেখ আছে। মার্কো পোলো নীলের চাষ দেখেছিলেন বর্তমান কেরলে।

য়ুরোপে নীল রঙ তৈরি করা হত সরষে জাতীয় একরকম ছোট গাছ থেকে, যার নাম ওড। এই গাছ থেকে রঙ তৈরি করা ছিল খুব লাভজনক ব্যবসা। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীরা বিপুল পরিমাণ অর্থ লগ্নী করেছিল নীল রঙ উৎপাদনের জন্য। তাই ভারতীয় নীল য়ুরোপে যাতে যেতে না পারে—ওখানকার ধনী ব্যবসায়ীরা সরকারের সহায়তায় তার ব্যবস্থা করেছিল। ওডের রঙ উজ্জ্বল ছিল না; তাই প্রথমে অল্প পরিমাণ ভারতীয় নীল মেশানো হত—যাতে চকচকে হয়ে ওঠে। যে বণিকরা নীল আমদানী করত তাদের কাছে এটা ছিল খুবই লাভের পণ্য। তারা চাইত যত বেশি পরিমাণ সম্ভব নীল এনে য়ুরোপের বাজারে ছাড়তে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী প্রভৃতি দেশে ওডের চাষ হত, ওড থেকে রঙ তৈরির

কারখানা গড়ে উঠেছিল অনেক। ভারতীয় নীল বাজার দখল করলে এই সমৃদ্ধ শিল্প ধ্বংস হবে। সুতরাং ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ হেনরী ১৬০৯ খ্রীস্টাব্দে আদেশ জারি করলেন, তাঁর রাজ্যে কেউ ভারতীয় নীল ব্যবহার করলে মৃত্যুদণ্ড হবে। জার্মানীতেও নীলের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল ১৬৫৪ খ্রীস্টাব্দে। সে-দেশের রঞ্জকদের প্রতি বৎসর একবার করে শপথ নিতে হত যে ভারতীয় নীল তারা ব্যবহার করবে না। নীলের ব্যবহার বন্ধ করবার জন্য প্রচার করা হয়েছিল যে এর মধ্যে এমন কিছু আছে যাতে কাপড়-জামা তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায়। ইংরেজরা প্রচার করেছিল, নীল বিষাক্ত।

এত করেও ভারতের নীল য়ুরোপের বাজার থেকে সম্পূর্ণ বহিষ্কার করা গেল না। গুণের দ্বারা সে ধীরে ধীরে জয় করল য়ুরোপের বাজার। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতীয় নীলের উপর যেসব নিষেধাজ্ঞা ছিল তা প্রায় দূর হয়ে গেল। নীলের চাহিদা বাড়ল। নীলের চাষ এবং কাঁচামাল থেকে রঙ তৈরির শিল্প সবই ছিল ভারতীয়দের হাতে। কয়েক বছরের মধ্যেই নীলের ব্যবসা খুব লাভজনক হয়ে দাঁড়াল। অপরিমিত লাভের আকাঙ্ক্ষায় শিল্প-মালিকরা শুরু করল নীলে ভেজাল দিতে। বালি আর মাটির গুঁড়ো মিশিয়ে নীলের ওজন বাড়ানো হত। ফাঁকিটা ধরা পড়তে দেরি হল না। ভারতীয় নীলের প্রতি বিমুখ হল য়ুরোপের ক্রেতারা। তাদের চাহিদা মেটাবার জন্য এগিয়ে এল পশ্চিম ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। য়ুরোপের নানা দেশ থেকে লোক এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। তারা শুরু করেছে নীলের চাষ। খুব ভাল নীল উৎপন্ন হতে লাগল আধুনিক পদ্ধতিতে।

কিন্তু নানা কারণে এসব জায়গায় নীল চাষে মন্দা পড়ল কয়েক বৎসরের মধ্যেই। একটি বড় কারণ—আখের প্রতিযোগিতা। অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রমে বেশি লাভ পাওয়া যেত আখের চাষ ও চিনির ব্যবসায়ে।

ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলের উপরে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্য স্থাপিত হবার পর ডিরেক্টরদের ভাবনা হল—জমি থেকে আয় বাড়ানো যায় কি উপায়ে? এদেশের নীল বিদেশের বাজারে যে কিরূপ সমাদৃত হত তা তাঁদের অজানা ছিল না। পশ্চিম ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পোর্তুগীজ, স্প্যানিশ, ওলন্দাজ এবং ফরাসী বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হত ইংরেজদের। ভারতে তেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। জমি সস্তা, শ্রমিকের পারিশ্রমিক খুবই কম, অথচ বেশি দরে বিক্রি হয় এদেশের নীল। সুতরাং কোম্পানী নিজের কর্মচারীদের এবং ইংরেজ

ব্যবসায়ীদের নীল চাষে উৎসাহিত করতে লাগল। শুধু কথায় নয়, টাকা দিয়ে। গোড়ায় নীল চাষের পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব ছিল কোম্পানীর; প্রথম কয়েক বৎসরে এ-বাবদ কোম্পানীর লোকসান হয় প্রায় আশি হাজার পাউণ্ড। ১৭৮৬ সাল পর্যন্ত নীল চাষে লোকসানের পরিমাণ ছিল আটাশ পার্সেন্ট। নীল চাষের তত্ত্বাবধানের জন্য কোম্পানী প্রথম এক চুক্তি করেছিল জেমস প্রিন্সেপের সঙ্গে। আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় নতুন চুক্তি হল রবার্ট সাহেবের সঙ্গে, পাঁচ বছরের জন্য। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে নীল চাষের অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর। নীল শিল্প স্বনির্ভর হবার পর কোম্পানী তার দায়িত্বের লাগাম শিথিল করে উদ্যোগী নীলকরদের হাতে ভার ছেড়ে দিল।

ব্যবসায়ের দিক থেকে এর ফল ভালই হয়েছিল। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে শুধু নিম্নবঙ্গে প্রায় পাঁচশ নীল কুঠীর হিসাব পাওয়া যায়। এসব কুঠীর মালিক প্রায় সবই ছিল য়ুরোপীয়ান। বর্ধমান জেলার খন্যান কুঠীর মালিক ১৮৩০ সালে এক বাঙালী ছিল, নাম দীগ্‌নারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

নীল কুঠী পল্লীগ্রামের চেহারা পালটে দিল। বহু লোক নানা চাকরি পেল; গ্রামের অশিক্ষিত এবং স্বল্পশিক্ষিত অনেকেরই বেকারত্ব ঘুচল। জমিদারদের বহু জমি অনাবাদী পড়ে থাকত, সেইসব জমিতে চাষ আরম্ভ হল। নীলের আয় বৃদ্ধির সুযোগে তারা খুশি। শিক্ষিতরাও পেল কেরানীর কাজ। নীলের ব্যবসায়-সংক্রান্ত নানা কাজে ছোটখাট বাঙালী কনট্রাক্টর ও ব্যবসায়ীদের নিকট একটা উপার্জনের নতুন পথ খুলে গেল। অর্থাৎ চাষী, মজুর, কেরানী, ব্যবসায়ী, জমিদার প্রভৃতি সকলেই নীলের চাষ থেকে উপকৃত হয়েছে। প্রথমদিকে অত্যাচার ছিল না। জমিদার আগে প্রজাকে দিয়ে বেগার খাটাত। কিন্তু নীলকর সাহেবরা কাউকে বেগার দিতে বলেনি। এইসব দেখেই রামমোহন ও দ্বারকানাথ নীলের চাষ সমর্থন করেছিলেন। সীমাহীন লোভ নীলকরদের পরবর্তীকালে কিরূপ অত্যাচারী করে তুলবে তা ছিল তাঁদের কল্পনাতীত।

নীলকরদের অত্যাচার সাতান্ন সালের বিপ্লব ত্বরান্বিত করেছে; সাহিত্য ও রাজনীতিতে এদের প্রভাব গভীর। মহাত্মা গান্ধী নীলকরদের অত্যাচার থেকে রায়তদের রক্ষা করবার জন্য চম্পারণে সত্যাগ্রহ করেছিলেন। অর্থনীতির উপর নীল চাষের প্রভাব কম নয়। জার্মান বিজ্ঞানী বেয়ার কৃত্রিম নীল আবিষ্কার না করা পর্যন্ত নীলের ব্যবসা ভারতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে ছিল। ঊনবিংশ শতকের বাংলার ইতিহাসের অনেকটা জুড়ে আছে নীল চাষের

কথা। সেসব কথা বহু আলোচিত এবং সুপরিচিত। সুতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই।

ব্রিটিশ আমলে আধুনিক পদ্ধতিতে নীল চাষের প্রবর্তক কে? যিনি ভারতের, বিশেষ করে বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছেন, তিনি কিন্তু ইংরেজ নন। তাঁর নাম প্রায় অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। যাঁরা নীল চাষের ইতিহাস লিখেছেন—তাঁরাও এঁকে উপেক্ষা করেছেন।

ভারতের প্রথম য়ুরোপীয় নীলকরের নাম লুই বোনো (**Louis Bonnaud**)। এইচ. জে. রেইনি এই নাম দিয়েছেন, কিন্তু রীড দিয়েছেন অন্যরূপ—**Bonnaurd.** তবে নানা কারণে প্রথম নামটিই যথার্থ বলে মনে হয়। রেইনির একটি প্রবন্ধ থেকে আমরা অনেক তথ্য নিয়েছি।

বোনো জাতিতে ফরাসী। ১৭৩৫ থেকে ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তাঁর জন্ম হয়েছিল মার্সেই শহরে। বাবা ফরাসী সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে রেখে তিনি মারা গেলেন। এদের মানুষ করবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পড়ল মায়ের উপরে।

অসহায় বিধবার পক্ষে ছেলেদের বেশিদূর পড়ানো সম্ভব হয়নি। বড় ছেলে ফ্রাঁসোয়া জাহাজে চাকরি নিল। ছোট ছেলে বোনো দুরন্ত, পড়ায় মন নেই, দস্যিপনা করে বেড়ায়। কিছুদিন পরে তাকেও দাদার জাহাজে দেওয়া হল। উপার্জন হোক আর না হোক, স্বভাবটা সংযত হবে। দাদার সঙ্গে জাহাজে চড়ে দেখা হল পৃথিবীর অনেক দেশ। অল্প বয়সেই জীবন সম্বন্ধে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ পেলেন বোনো।

একবার জাহাজ যাত্রা করেছে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দিকে। ঝড় উঠল; ঝড়ের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে জাহাজ চূর্ণ হয়ে গেল। ফ্রাঁসোয়া আর বোনো উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে লড়াই করতে করতে সমুদ্রের বুকে ভেসে চললেন। দু'ভাই কিছুক্ষণ পাশাপাশি ছিলেন। তারপর দৈত্যের মত এক ঢেউ এসে কোথায় ছিনিয়ে নিয়ে গেল দাদাকে, আর দেখতে পাওয়া গেল না। অন্য-এক ঢেউ বোনোকে এনে ফেলল এক দ্বীপে। সেখানকার অধিবাসীদের যত্নে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন।

এই বিপর্যয়ের পর বোনো দেশে ফিরে কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে আবার যাত্রা করলেন পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দিকে। এতদিনে তিনি সমুদ্র-জীবনের উপরে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছেন। স্থির করলেন আর জাহাজে-জাহাজে ঘোরা নয়। সামান্য যা অর্থ সঞ্চয় করতে পেরেছেন তাই দিয়ে ব্যবসা করবেন। নীল চাষের

অভিজ্ঞতা লাভ করলেন মরিসাস দ্বীপে। ব্যবসা করে কয়েক বছরের মধ্যে বেশ কিছু টাকা জমল।

ব্যবসা বন্ধ করে দেশে ফিরতে হল। মায়ের অসুখ ও মৃত্যু। বোনদের বিয়ে, বাড়ির ব্যবস্থা ইত্যাদি পারিবারিক কর্তব্য সেরে আবার পাড়ি দিলেন বিদেশে। নতুন উদ্যমে ব্যবসা আরম্ভ করলেন। প্রথম সারির ব্যবসায়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে দেরি হল না। প্রচুর ধন-সম্পত্তির মালিক হলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমাগত তাঁকে তাড়া করে চলেছে। পর-পর কয়েকটি পণ্য-বোঝাই জাহাজ ডুবে গেল। সেই সঙ্গে শেষ হল তাঁর ব্যবসা। সঞ্চিত অর্থ গেল নিঃশেষ হয়ে। বারবার আঘাত পেয়েও কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্র নন তিনি। নতুন করে ভাগ্যের অন্বেষণে এলেন বাংলাদেশে। দেশ-বিদেশের ব্যবসায়ীদের কাছে তখন স্বর্ণপ্রসূ বলে বাংলার খুব নামডাক। সেটা ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দ অথবা কাছাকাছি কোনো সময়।

ফ্রান্সের নাগরিক, সুতরাং এসে উঠলেন ফরাসী চন্দননগরে। ছোট একটি বাগান কিনে বোনো সেখানে নীল কুঠী নির্মাণ করলেন। চন্দননগর থেকে সোজা উত্তরে তালডাঙ্গা গ্রাম, হুগলী জেলার অন্তর্গত। কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেল স্থান নির্বাচন ভুল হয়েছে। এত ছোট জায়গা যে কুঠী বাড়াবার সুযোগ নেই। আর সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল জলের। গঙ্গা অনেক দূর। নীল-গাছগুলি পাটের মত জলে ভিজিয়ে রাখবার জন্য যথেষ্ট জলের অভাব।

এইসব অসুবিধার জন্য য়ুরোপীয়ান-পরিচালিত সর্বপ্রথম নীল কুঠীটি অল্পদিনের মধ্যেই বন্ধ করতে হল। এবার বোনো চলে এলেন চন্দননগরের দক্ষিণে। তেলিনিপাড়ার কাছে গোন্দলপাড়ায় বিস্তৃত জায়গা ইজারা নিলেন। নদীর উপরেই জায়গা। জলের কোনো অসুবিধা নেই। গোন্দলপাড়ার কুঠীতে দুটো বড় চৌবাচ্চা তৈরি হল। তাতে জল ভর্তি করে নীল গাছ ভেজানো হবে। আর একটা বসানো হল নিষ্কাশন যন্ত্র। জলে-ভেজা গাছগুলি পিষে তরল রঙ বের করা হবে। প্রথমে এই দিয়েই নীল কুঠীর কাজ চালানো হত। পরে অবশ্য কত নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হত।

বোনোর দুর্ভাগ্য তাঁকে চন্দননগরেও তাড়া করেছে। ফরাসী গভর্নর কি জানি কেন তাঁর উপরে সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাঁকে বিপদে ফেলবার জন্য ওত পেতে ছিলেন। সুযোগও একটা এসে গেল। এক রাত্রিতে একদল ডাকাতের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাঁকে আপ্রাণ লড়াই করতে হয়েছিল। এই সংগ্রামে একজন

ডাকাত নিহত হয়, অন্যরা সব পালিয়ে যায়। চন্দননগরের গভর্নর স্থির করলেন নরহত্যার অপরাধে বোনোর বিচার করতে হবে। কিন্তু তখন কোনো য়ুরোপীয়ের বিচারই ভারতে হত না। আসামীকে পাঠাতে হত নিজের দেশে। গভর্নর স্থির করলেন বোনোকেও ফ্রান্সে পাঠানো হবে।

গভর্নরের আশা ছিল তিনি সরকারী মহলে প্রভাব বিস্তার করে বোনোকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করতে পারবেন। কিন্তু গভর্নরের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিলেন স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁরা দাবি জানালেন, বোনোর নির্দোষিতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্য তাঁদেরও ফ্রান্সে পাঠাতে হবে। এই প্রবল দাবি গভর্নরের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিল।

গোন্দলপাড়ার কুঠী স্থাপিত হয়েছিল ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ। এই একটি কুঠী নিয়েই বোনো তৃপ্ত থাকতে পারেননি। নানা জায়গায় তিনি নীলের ব্যবসা করেছেন, একা অথবা অংশীদার নিয়ে। তাঁর দৃষ্টান্ত থেকে প্রেরণা লাভ করে চন্দননগরের দুজন ফরাসী ডাক্তার নীলের চাষ শুরু করে। এতে ইংরেজ নীলকররা বেশ রুষ্ট হয়েছিল। ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে দুই নীলকর—ব্লুম ও ব্যারেটস জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করে যে চন্দননগরের কয়েকজন 'য়ুরোপীয়ান অ্যাডভেঞ্চারার' তাদের কুঠীর বড় কাছাকাছি এসে কুঠী খুলছে। এর ফলে নানা সমস্যা দেখা দেবে।

বোনো ব্যবসায়ের ব্যাপারে ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতেন। তিনজন ইংরেজের সঙ্গে মালদায় নীলের চাষ করতে গিয়েছিলেন। এখানে প্রয়োজনীয় চুনের অভাব ছিল বলে মুসলমান কবরখানা থেকে মানুষের হাড় তুলে এনে কাজ চালাতেন। বাঁকিপুর, কালনা, নয়াহাট্টা (যশোর), মির্জাপুর (কৃষ্ণনগর) প্রভৃতি অনেক জায়গায় নীল কুঠীতে 'ওয়ার্কিং পার্টনার' হিসাবে কাজ করেছেন। ইংরেজরা তাঁর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সমাদর করত। কালনা কুঠী তিনি ত্যাগ করেন ১৮১৯ সালে। উৎপাদনের দিক থেকে এখানে তিনি সবচেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পুঁজিপতি অংশীদার ঘোড়দৌড় খেলে দেউলে হওয়ায় কুঠী বন্ধ হয়ে গেল।

নীল ছাড়া অন্য ব্যবসাও তিনি আরম্ভ করেছিলেন। চন্দননগরে তাঁর হাজীনগরের বাগানবাড়িতে তিনি তাঁবু ও পাটের দড়ি তৈরির কারখানা করেন। কিছুদিন বেশ কাজকর্ম চলবার পর অকস্মাৎ আগুন লেগে সব ছাই হয়ে যায়। সমস্ত সঞ্চয় নিঃশেষ হয়ে যাবার ফলে হয়ত চাকরি নিয়ে, অথবা অংশীদার হয়ে

তিনি চন্দননগর থেকে দূরে নানা কুঠীতে কাজ করেছেন।

বোনো চন্দননগরের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতেন। তাঁকে 'প্রথম নাগরিক'-এর সম্মান দেওয়া হয়েছে। ফরাসী বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের রাজা বন্দী হয়েছেন সংবাদ পৌঁছবার পর চন্দননগরেও বিপ্লবীদের সমর্থনে বিক্ষোভ দেখা দেয়। বোনো এই বিক্ষোভের অন্যতম নেতা ছিলেন। রাজার প্রতিনিধি গভর্নরকে বন্দী করা হল। বিপ্লব-সমর্থকদের হাতে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হল। ফ্রান্সে লোকতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল, কিন্তু গভর্নর চন্দননগরের শাসনভার জনপ্রতিনিধিদের হাতে না দিয়ে কলকাতা গিয়ে ব্রিটিশ সরকারের আশ্রয় নিলেন।

প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর বোনো দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন চন্দননগরের সরকারী চিকিৎসকের মেয়েকে, ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর দুই ছেলে। শেষ বয়সে আর্থিক অনটনের মধ্যে তাঁর দিন কেটেছে। তাছাড়া ছিল ব্যর্থতাবোধের পীড়া। এত কুঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে দেখলেন তাঁর কোনো উদ্যোগই সফলতা অর্জন করে শেষ পর্যন্ত টিকে রইল না। ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। বয়স তখন আশির উপরে।

প্রথম প্রবর্তকের হাজারো সমস্যার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছে। কিন্তু সাফল্যের স্বস্তি ভোগ করা তাঁর ভাগ্যে ছিল না।

প্রথম বাঙালী খ্রীস্টান

যতদূর জানা যায়, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভূষণার জমিদারের এক পুত্রকে পোর্তুগীজ জলদস্যুরা অপহরণ করে ১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ তাঁকে আরাকানে নিয়ে যায়। পোর্তুগীজ জলদস্যুরা এরকম বহু যুবককে হরণ করে বিদেশে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করত। জমিদারপুত্রের ভাগ্য ছিল অনুরূপ। তাঁকে দেখে এক খ্রীস্টান পোর্তুগীজ পাদরীর দয়া হয় এবং তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে যান। পরে খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত করে নাম রাখেন দোম আন্তোনিয়ো। আন্তোনিয়ো ক্রমে পোর্তুগীজ ভাষায় দক্ষতা লাভ করেন এবং খ্রীস্টধর্ম প্রচারের কাজে ব্রতী হন। পোর্তুগীজ লিপিতে তাঁর রচিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' বাংলা গদ্যের অন্যতম আদি গ্রন্থ। প্রকৃতপক্ষে দোম আন্তোনিয়ো প্রথম বাঙালী খ্রীস্টান। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাবৃত খ্রীস্টান ছিলেন না। দস্যুরা বলপূর্বক অপহরণ করায় ভাগ্যের চক্রান্তেই তাঁকে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল। প্রচলিত কিংবদন্তী থেকে জানা যায় যে, তিনি কয়েক বছর পরে দেশে ফিরে তাঁর স্ত্রী এবং অন্য কয়েকজন আত্মীয়কে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু এর কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

প্রথম স্বেচ্ছাবৃত বাঙালী খ্রীস্টান কৃষ্ণচন্দ্র পাল। একথা খ্রীস্টানদের বিভিন্ন পুস্তকে এবং প্রতিবেদনেও পাওয়া যায়। তিনি প্রথম খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর তারিখে।

একজন বাঙালী হিন্দু ধর্মান্তর গ্রহণ করলেও হিন্দু সমাজে তা নিয়ে কোনো আলোড়ন সৃষ্টি হয়নি। অথচ এর কিছুকাল পরে মধুসূদন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তরু দত্তের পিতা সপরিবারে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করায় সমগ্র শিক্ষিত হিন্দু সমাজ আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিদের নেতৃত্বে কলকাতায় একটি বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং পরে বাংলাদেশের বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের আহ্বান করে একটি বিচারসভার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিচারের বিষয় ছিল ধর্মান্তর গ্রহণ অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুতর অপরাধ করা সত্ত্বেও কেউ কেউ যখন প্রায়শ্চিত্ত করে সমাজে পুনরায় গৃহীত হয়েছে, তখন খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করলেই কোনো ব্যক্তি কেন সারাজীবনের জন্য পতিত হয়ে থাকবে? অধিকাংশ পণ্ডিত পাঁতি দেন যে, প্রায়শ্চিত্ত করে এরাও হিন্দু সমাজে ফিরে আসতে পারবে।

এই উদ্দেশ্যে 'পতিতোদ্ধার সভা' স্থাপিত হয় এবং কোনো কোনো খ্রীস্টধর্ম গ্রহণকারী হিন্দু এভাবে পুনরায় সমাজে ফিরে এসেছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র শিক্ষিত সমাজের কেউ ছিলেন না বলেই হয়ত এ-বিষয়ে কোনো সাড়া জাগেনি। তাছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে খ্রীস্টান হবার দৃষ্টান্ত ছিল উপেক্ষণীয়। পরবর্তীকালে এই সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৫১ সালে বাঙালী খ্রীস্টানের সংখ্যা ছিল ১৪,১৭৭ জন; ১৮৬১ সালে ২০,৫১৮ জন; ১৮৭১ সালে ৪৬,৯৬৮ জন এবং ১৮৮১ সালে ৮৩,৫৮৩ জন।

কৃষ্ণচন্দ্র পালের জন্ম আনুমানিক ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে, চন্দননগরের নিকটবর্তী বড়া গ্রামে। যে-পরিবারে তাঁর জন্ম, সেই পরিবারের বংশপরম্পরাগত পেশা ছিল সূত্রধরের। কৃষ্ণচন্দ্রও এই পেশা আরম্ভ করেন। খ্রীস্টান প্রচারকদের বক্তব্য: স্বয়ং যিশুখ্রীস্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন সূত্রধর পরিবারে, এবং প্রথম বাঙালী খ্রীস্টানও যে সূত্রধর বংশজাত, এটা তাঁরই অভিপ্রেত।

কর্মসূত্রে কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরামপুরে আসেন। এখানে এসে তিনি মিশনারীদের খ্রীস্টধর্ম-প্রচার শুনতে পান। তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ ঘটে যখন একদিন আকস্মিকরূপে স্নানের ঘাটে পড়ে গিয়ে তাঁর কাঁধের হাড় স্থানচ্যুত হয়। কৃষ্ণচন্দ্রের কন্যা শ্রীরামপুর মিশনের ডাক্তার টমাসকে নিয়ে আসে। তাঁর সুচিকিৎসায় এবং কেরীর ওষুধে কৃষ্ণচন্দ্রের বেদনার উপশম ঘটে। এই দুর্ঘটনার সূত্র থেকেই শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের বিশেষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

সুস্থ হবার পর কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর বন্ধু গোকুলকে নিয়ে একদিন মিশনে উপস্থিত হন। পাদরীরা তাঁদের খাবারের টেবিলে আহ্বান করে একসঙ্গে জলযোগ করেন। মিশনের পরিচারকরা এই সংবাদ অবিলম্বে বাইরে প্রচার করে দেয়। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর বন্ধুকে নিয়ে যখন বাড়িতে ফিরছিলেন তখন প্রতিবেশীরা তাঁদের উপরে হামলা করতে শুরু করে। তাঁদের অপরাধ, সাহেবদের সঙ্গে খানা খেয়ে তাঁরা জাতিচ্যুত হয়েছেন। পাছে জাতিভ্রষ্ট হয় এই আশঙ্কায় জ্ঞাতিরা কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বাড়ি থেকে অন্যত্র নিয়ে যায়। পরে একদল লোক কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর বন্ধুকে শ্রীরামপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করে। তাদের অভিযোগ, এরা সাহেবদের সঙ্গে খানা খেয়ে ধর্মচ্যুত হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, এ-বিষয়ে তাঁর কিছু করার নেই। তিনি বিচারের জন্য গভর্নরের কাছে যেতে বললেন। গভর্নরের কাছে নিয়ে গেলে তিনি সব শুনে বললেন, "এরা কোনো অপরাধ করেনি। সাহেবও হয়নি, হয়েছে খ্রীস্টান। এ তো ভাল কাজ! তোমরা এদের

কোনো ক্ষতি করলে তোমরাই মুশকিলে পড়বে। কৃষ্ণচন্দ্রের মেয়েকে এখনই ফিরিয়ে দাও।"

কৃষ্ণচন্দ্র ও গোকুল যখন বাড়ি ফিরছিলেন তখন চার-পাঁচশ লোক তাঁদের 'ফিরিঙ্গি' বলে বিদ্রূপ করতে লাগল। পরদিন সকালে কৃষ্ণচন্দ্রের বাড়ির সামনে প্রায় দু'হাজার লোকের সমাবেশ হয় এবং তারা কৃষ্ণচন্দ্রকে নানারকম ভয় দেখাতে থাকে। সমস্ত এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। কৃষ্ণচন্দ্র জানতে পারলেন রাত্রিতে তাঁকে গোপনে হত্যা করা হতে পারে। এই কথা জানার পর গভর্নর কৃষ্ণচন্দ্রের বাড়ি পাহারা দেবার জন্য একজন সিপাহী পাঠিয়ে দেন।

সমাজের এই বিরোধিতা কৃষ্ণচন্দ্রের মনকে ক্রমশ খ্রীস্টধর্মের প্রতি এগিয়ে দেয়। তিনি সুযোগ পেলেই মিশনারীদের প্রচার শুনতে যেতেন এবং শেষে সিদ্ধান্ত নিলেন যে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করবেন। বন্ধু গোকুলও সম্মত হন। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর রবিবার ধর্মান্তরের দিন স্থির হল (তখন কৃষ্ণচন্দ্রের বয়স আনুমানিক ছত্রিশ বছর)। সেদিন দুপুরে এই দীক্ষাকার্য সম্পন্ন হবে। তার আগে গঙ্গায় স্নান করে আসা প্রয়োজন। মিশনারীদের মনে গঙ্গাস্নান সম্বন্ধে প্রথমে দ্বিধা ছিল। কারণ তাহলে হিন্দুরা হয়ত মনে করবে যে পাদরীরাও তাদের মতই গঙ্গাকে পুণ্যসলিলা বলে মান্য করে। কিন্তু আসলে তা নয়। একথা কেরী নিজেই দীক্ষার সময় সমবেত জনতাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন। দীক্ষার সময় জলের প্রয়োজন হয়—এজন্যেই সন্নিকটে প্রবাহিত গঙ্গায় স্নান।

গোকুল যদিও খ্রীস্টধর্ম গ্রহণে সম্মত হয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সাময়িক-ভাবে পিছিয়ে গেলেন। সেদিন ধর্মান্তরের অভিনব দৃশ্য দেখার জন্য কলকাতা, চন্দননগর ও শ্রীরামপুর থেকে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীস্টানের এক বিশাল জনতা সমবেত হয়েছিল। এদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় গভর্নর এবং রাস্তার ওপারে একটি ঘরে বন্দী ছিলেন ডাক্তার টমাস ও কেরী সাহেবের রুগ্ণা স্ত্রী। টমাস সতেরো বছর যাবৎ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে নানাবিধ কাজ করেছেন এবং সর্বত্রই তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন দেশীয় লোকদের খ্রীস্টান করবার জন্য। তাদের অনেকেই তাঁকে আশ্বাস দিয়েছে, নানা সুযোগ গ্রহণ করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলেই পিছিয়ে গেছে। সেই দীর্ঘ সতেরো বছরের হতাশার পর এইবার প্রথম এল পরিপূর্ণ সাফল্য। তারই আনন্দে টমাস মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। অবস্থা এমন যে, তাঁকে ঘরে বন্দী করে রাখা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

উইলিয়াম কেরী তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ফেলিক্স ও বাঙালা কৃষ্ণচন্দ্রকে নিয়ে গঙ্গার জলে অবগাহন করবার জন্য নামলেন। ফেলিক্সেরও জন্মোত্তরের দীক্ষা হবে। অবগাহনের পর কৃষ্ণচন্দ্র ও ফেলিক্সের দীক্ষা দিয়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল।

একজন হিন্দুর খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের এই অনুষ্ঠানের পর শ্রীরামপুর অঞ্চলে একটা ভয় ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। এর ফলে ঐ এলাকার, বিশেষ করে মিশনারী-পরিচালিত বঙ্গবিদ্যালয়গুলি দীর্ঘকাল যাবৎ ছাত্রশূন্য হয়ে ছিল।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কৃষ্ণচন্দ্র এর পূর্বে দুবার দীক্ষা নিয়েছিলেন। প্রথমবার, মালপাড়ার এক গোস্বামীর শিষ্য হন। পরে ঘোষপাড়ার কর্তাভজা দলের গুরু রামচরণ পালের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। এরও পরে তিনি গুরুসত্য সম্প্রদায়ের প্রধান রামদুলাল ঘোষের শিষ্য হন এক দুরারোগ্য ব্যাধির কবল থেকে মুক্ত হবার আশায়। এই গুরুর গোপন উপদেশ ছিল জাতি না মানার এবং প্রতিমা-পূজা না করার। মিশনারীদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর কৃষ্ণচন্দ্রের মনে হয়েছিল পূর্বোক্ত গুরুরা তাঁর দেহের রোগের উপশম করতে পারেন, কিন্তু একমাত্র যিশুই পারবেন আত্মিক সুস্থতা অক্ষুণ্ন রাখতে।

১৮০১ সালে মোট ছয়জন বাঙালী হিন্দু খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কৃষ্ণচন্দ্রের শ্যালিকা জয়মণি, যিনি প্রথম বাঙালী মহিলা খ্রীস্টান। এর কিছুকাল পরে কৃষ্ণচন্দ্রের স্ত্রী এবং তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা ও জামাতা—যারা একদিন খ্রীস্টান পরিবেশ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল, তারাও ফিরে এসে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে।

প্রথম হিন্দু ব্রাহ্মণ খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দের ২২ জানুয়ারি তারিখে। তাঁর নাম কৃষ্ণপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। অব্যবহিত পরে তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যমা কন্যাকে বিবাহ করেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, "১৮০২ খ্রীস্টাব্দে পীতাম্বর সিং নামক কায়স্থ জাতীয় এক ব্যক্তিকে তাঁহারা (শ্রীরামপুরের মিশনারীরা) সর্বপ্রথম খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করেন।" ('রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', ৩য় সং, পৃ ৭৪)। এ-তথ্য কোন্ সূত্র থেকে পাওয়া গেছে জানা যায় না।

খ্রীস্টান হবার কিছুকাল পরে কৃষ্ণচন্দ্র খ্রীস্টধর্ম-প্রচারক হিসাবে কাজ আরম্ভ করেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই কাজই করেছেন। এই কাজ উপলক্ষে তিনি বাংলার এবং অন্যান্য প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। শ্রীহট্ট থেকে কাশী, ঢাকা থেকে উড়িষ্যা প্রভৃতি নানা অঞ্চলে প্রচারের কাজ নিয়ে তাঁকে যেতে

হয়েছে। দুর্গম খাসিয়া পাহাড়েও তিনি যেতে দ্বিধা করেননি। মিশনারী সাহেবরা তাঁর এই কাজকে বিশেষ মূল্য দিয়েছিলেন। কারণ, একজন বাঙালী খ্রীস্টান খ্রীস্টের বাণী প্রচার করলে ভারতীয় শ্রোতাদের কাছে যতটা আকর্ষণীয় হবে, বিদেশী পাদরীদের বক্তৃতায় ততটা হবে না।

ভক্ত ও বিশ্বস্ত খ্রীস্টান হিসাবে কৃষ্ণচন্দ্র বাংলায় কয়েকটি খ্রীস্টসঙ্গীত রচনা করেছিলেন, যা প্রার্থনা-সভায় গীত হত। ১৮২২ খ্রীস্টাব্দের ২২ অগাস্ট ওলাউঠা রোগে কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

পাঠপঞ্জী

১ Marshman, J. C. *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward*. Vol. I, 1859, pp. 135-40

২ Different issues of Baptist Mission Reports.

৩ মথুরানাথ নাথ, সঙ্কলক। 'কৃষ্ণচন্দ্র পাল', কলকাতা, ১৯০৮

সাতান্ন বিপ্লবের ঐতিহ্য

আঠারো শ' সাতান্ন সালের বিপ্লবের শতবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা একশ বছর পূর্বেকার ঘটনাটিকে নতুন করে বিচার করবার সুযোগ পেয়েছি। এই বিপ্লবের প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক হয়েছে, কিন্তু কোনো পক্ষই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। বিপ্লবের কারণ ও প্রকৃতি যা-ই হোক না কেন, এর প্রভাব যে আমাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে অপরিসীম—তাতে সন্দেহ নেই। সাতান্ন সালের বিপ্লবের রক্তাক্ত পথেই আধুনিক ভারতের যাত্রা শুরু হয়েছে। সেদিনের সেই বিপ্লবীদের প্রতি আমাদের ঋণ সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট সচেতন নই। এই উপলক্ষে প্রকাশিত অধিকাংশ পুস্তক ও প্রবন্ধের সিদ্ধান্ত এই যে, বিপ্লব শুধু সিপাহীদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, এর প্রতি বৃহত্তর জনসাধারণের কোনো সহানুভূতি ছিল না। সুতরাং একে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ আখ্যা দেওয়া ভুল।

ভারতের ইতিহাসে সাতান্ন সালের বিপ্লব যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে, তা থেকে এক শতাব্দী পরে আমাদের উপলব্ধি করা কঠিন নয় যে, সিপাহীদের মধ্যে বিক্ষোভ সীমাবদ্ধ থাকলে তার ফল এমন সুদূরপ্রসারী হত না। সিপাহীরা অবশ্যই প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে এটা নতুন কিছু নয়। হিন্দু ও মুসলমান আমলে যখনই রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন ঘটেছে, তখন সে-পরিবর্তন এনেছে সেনাবাহিনী, সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ফলে সামান্যই বিঘ্নিত হয়েছে। অন্য দেশের মত ভারতে সেনাবাহিনীর সঙ্গে জনসাধারণের নিবিড় ঘনিষ্ঠতা কোনোকালেই ছিল না। থাকলে, মুষ্টিমেয় বিদেশী সৈন্যের পক্ষে বারবার ভারত জয় করা অসম্ভব হত।

সাতান্ন সালের বিপ্লবের প্রকৃতি যথার্থরূপে বিচারের সর্বাপেক্ষা বড় বাধা এই যে, বিপ্লবীদের নিজেদের কথা জানা যায় না। বিপক্ষের রচিত ইতিহাসের উপরে আমাদের নির্ভর করতে হয়। বলা বাহুল্য, সে ইতিহাস পক্ষপাতদুষ্ট। তথাপি বিপ্লবীরা যে জনসাধারণের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেছিল এবং তা পেয়েও ছিল, সেকথা আমরা জানতে পারি নানা সূত্রে। ডঃ ডাফ বিপ্লবের গতিপ্রকৃতি প্রত্যক্ষ করে মন্তব্য করেছেন: **"From the very outset, it had been gradually assuming more and more the character of a rebellion—a rebel-**

lion on the part of vast multitudes beyond the Sepoy army, against British supremacy and sovereignty.*

জনসাধারণের সমর্থন না থাকলে বিপ্লব কখনো এরূপ শক্তিশালী ও ব্যাপক হতে পারত না। যাঁরা এই বিপ্লবকে শুধুই কয়েকজন সিপাহীর বিদ্রোহ বলে প্রমাণ করতে চান, তাঁদের মনে রাখা উচিত যে, এরূপ বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী এবং ধর্মাবলম্বীর সম্মিলিত বিপ্লব ভারতের ইতিহাসে এর পূর্বে কখনো হয়নি।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা 'সমাচার সুধাবর্ষণ' থেকে গণ-সমর্থনের প্রমাণ পাওয়া যায়। ২৩ মে (১৮৫৭) তারিখের পত্রিকায় বলা হয়েছে যে, আগ্রা শহরের নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলের লোকেরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র কিনছে। তারা বলছে, "আমরা সকল শক্তি দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়ব, মৃত্যু হয় তা-ও ভাল।" সম্পাদক এর উপর মন্তব্য করছেন, "দেখা যাক, এর ফল কি দাঁড়ায়!"

ঐ পত্রিকা ৯ জুন খবর দিচ্ছে যে, গোগরা নদীর তীরবর্তী তুলসীপুর ও সালিতিপুর মহলের জমিদাররা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য ৬০,০০০ সিপাহী এবং ১,১২,০০০ গ্রামবাসী সংগ্রহ করেছে।

'সমাচার সুধাবর্ষণ' ৬ জুন লিখছে: নির্বোধ সিপাহীরা ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়াবার জন্য সকল সম্ভাব্য উপায় অবলম্বন করেছে। তারা আলোয়ার, রামপুর, ভরতপুর, পাতিয়ালা, গোয়ালিয়র, কাশ্মীর, নেপাল প্রভৃতি রাজ্যের রাজাদের নিকট এবং সাঁওতাল পরগণার নেতাদের নিকট সাহায্যের আবেদন করেছিল। কিন্তু ঐসব দেশীয় রাজ্যের শাসকরা সাহায্য করবার পরিবর্তে সিপাহীদের দমন করবার জন্য সসৈন্যে ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

অনেকে প্রশ্ন করেছেন, বিপ্লবের প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতির প্রমাণ বাংলা-দেশ থেকে পাওয়া যায় না কেন? বাংলা সাহিত্যে সমসাময়িক এমন কোনো প্রমাণ নেই, যা থেকে বুঝতে পারি বুদ্ধিজীবী বাঙালীর বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতি ছিল। বরং ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতির রচনা থেকে বিপ্লবের বিরোধিতা এবং ইংরেজ শাসনের সমর্থনই পাওয়া যায়। বাঙালী সাতান্ন সালের বিপ্লবের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল—এমন সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্রমবিবর্তনের দিক থেকে বিচার করলে অনৈতিহাসিক বলে মনে হবে। রাজা রামমোহন রায়ের দেশপ্রীতির অনুপ্রেরণা শিক্ষিত বাঙালী তরুণদের উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১৮৩৩ সালের সনদে সুপ্রীম কোর্টের স্বাধীনতা রইল না; সুপ্রীম কোর্ট কোম্পানীর অধীন হয়ে পড়ল। এর প্রতিবাদে টাউন হলে এক

বিরাট সভা হয়। সে সভায় 'জ্ঞানান্বেষণ'-সম্পাদক রসিককৃষ্ণ মল্লিক দেশের দুঃখ-দুর্দশার কথা বর্ণনা করে ওজস্বিনী ভাষায় যে বক্তৃতা করেন, তা নির্ভীক স্বদেশ-প্রীতির পরিচায়ক। 'জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র উদ্যোগে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কোম্পানীর পুলিশ ও ফৌজদারী আদালতের অবস্থা সম্বন্ধে হিন্দু কলেজে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় কোম্পানীর এমন কঠোর সমালোচনা ছিল যে, কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন সরকারের বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কায় বক্তৃতায় বাধা দিলে গণ্ডগোলের মধ্যে সভা বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৪৯ সালে মফস্বলের য়ুরোপীয়দের সাধারণ আদালতে বিচার করবার ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য একটি বিল আনা হয়। এই বিল য়ুরোপীয় মহলে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং এর নাম দেওয়া হয় 'ব্ল্যাক অ্যাক্ট'। প্রসিদ্ধ বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ এই বিল সমর্থন করে চারটি পুস্তিকা লিখেছিলেন। এর ফলে তিনি য়ুরোপীয় সমাজের বিরাগভাজন হন। 'এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি'র সহকারী সভাপতির পদ থেকে য়ুরোপীয় সদস্যরা তাঁকে অপসারণ করে। ১৮৫১ সালে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপিত হয় ভারতের দাবি পার্লামেণ্টে পেশ করবার উদ্দেশ্যে। একে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার জন্য বোম্বাই ও মাদ্রাজেও শাখা স্থাপন করা হয়েছিল।

১৮৫৮ সালে রঙ্গলাল তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় ?" লেখেন। পর বৎসর থেকে নীল-বিদ্রোহ শুরু হয়। এর কিছুকাল পরে নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সাতান্ন বিপ্লবের পূর্বে এবং অব্যবহিত পরে বাঙালার স্বদেশপ্রীতির প্রমাণ রয়েছে। শুধু সাতান্ন সালে রাজভক্তি ছাড়া বাঙালী আর কোনো প্রমাণ রেখে যেতে পারেনি, অতএব বিপ্লবের প্রতি বাঙালীর সহানুভূতি তো ছিলই না, বরং তারা বিপ্লববিমুখ ছিল—এই সিদ্ধান্ত কেউ কেউ করেছেন। বিপ্লবের প্রবল বিক্ষোভ ও কোম্পানীর সৈন্যদের অমানুষিক অত্যাচার অনুভূতি-প্রবণ বাঙালীর মন স্পর্শ করতে পারেনি—একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বিশেষ করে পূর্বে ও পরে অনেক সামান্য ব্যাপারেও সরকারের কঠোর সমালোচনা করতে যাঁরা দ্বিধা করেননি, তাঁরা সরকারের দমননীতি নীরবে সমর্থন করেছেন বলে মনে হয় না। ১৮৫৭ সালের ৬ অগাস্ট 'টাইমস' পত্রিকার একটি মন্তব্য থেকে দমন-নীতির প্রকৃতি বোঝা যাবে। এই মন্তব্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে প্রচার করা হয়েছিল :

"Let it be known that England will support the officers who may be charged with the duty of suppressing this Mutiny, and of inflicting condign punishment upon the bloodthirsty mutineers, however terrible the measures which they may see fit to adopt."

ব্রিটিশ কর্মচারীরা এই আশ্বাসবাণী পেয়ে বিদ্রোহ দমনের নাম করে যথেচ্ছ উৎপীড়ন করতে উৎসাহ লাভ করেছে।

বাঙালী কখনো সৈন্যের জীবন পছন্দ করেনি। ১৮৫৭ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত সেনাশিবিরের জীবনের প্রতি বাঙালীর বিতৃষ্ণা বোধহয় একই রকম। বাঙালী সৈনিক নিয়ে যদি পৃথক কোনো বাহিনী থাকত এবং সেই বাহিনী যদি বিপ্লবে যোগ দিত, তাহলে ইতিহাসে আমাদের নাম পাওয়া আজ কঠিন হত না। কঠোর নিয়মানুবর্তী সৈনিক জীবনের প্রতি বিমুখতা আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সুতরাং সশস্ত্র বিপ্লবী হিসাবে সাতান্ন সালে বাঙালীকে যদি দেখতে না পাই, তাহলে নতুন করে অভিযোগ করবার মত কিছু নেই। দেখতে হবে আমাদের ভাবজীবনে সাতান্ন সালের বিপ্লব কি প্রভাব বিস্তার করেছে; আমাদের চিন্তাধারায়, সাহিত্যে ও কর্মজীবনে ছাপ পড়েছে কিনা। বাংলা সাহিত্য সে সময়ই অন্যান্য আঞ্চলিক সাহিত্যের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছে। সুতরাং বিপ্লবের প্রভাব আমাদের সাহিত্যে পড়বে বলে আশা করা যায়। কিন্তু সরকারের সমর্থনসূচক কিছু কিছু দৃষ্টান্ত ছাড়া অন্য কোনো নিদর্শন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। না পাবার কারণ কি?

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণই ছিল এর প্রধান কারণ। ১০ মে অকস্মাৎ বিপ্লব শুরু হয়। এবং পরবর্তী মাসে ১৮৫৭ সালের ১৫নং আইন দ্বারা সরকার মুদ্রাযন্ত্রের কার্যকলাপ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন। ছাপাখানার মালিকদের লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। লাইসেন্স দেওয়া হত এই শর্তে:

১) এমন কোনো বই, পুস্তিকা এবং সংবাদপত্র ছাপবে না, যার উদ্দেশ্য সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণার উদ্রেক করা, জনচিত্তে অসন্তোষ জাগিয়ে তোলা, অথবা সরকারের আদেশ অমান্য করবার জন্য উত্তেজিত করা।

২) মুদ্রিত পুঁথিপত্রে জনসাধারণের মনে সরকারের কার্য সম্বন্ধে সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারবে না অথবা সরকার প্রজাদের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করছেন, এমন মতামতও প্রকাশ করা চলবে না।

৩) দেশীয় নৃপতি ও জমিদারদের সহিত সরকারের বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন কোনো মন্তব্য-সংবলিত পুথিপত্র ছাপাবে না। লাইসেন্স ছাড়া খুচরো টাইপ অথবা মুদ্রাযন্ত্রের কোনো অংশ রাখাও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। মুদ্রিত প্রত্যেকটি পুথিপত্র সরকারী দপ্তরে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক হল। এইসব শর্ত অমান্য করলে ছাপাখানার মালিক ও বেতনভুক মুদ্রাকর উভয়েরই দণ্ড হত এবং অপরাধের গুরুত্ব বেশি হলে মুদ্রাযন্ত্র বাজেয়াপ্ত করাও চলত। আপত্তিজনক পুথিপত্র বাজেয়াপ্ত করবার অধিকার তো অবশ্যই ছিল।

১৮২৩ সালেও সরকার একটি আইন করেন: "To regulate by-law the printing and publication within the Settlement of Fort William in Bengal of Newspapers...."

১৮৩৫ সালে লর্ড মেটকাফ এই আইন রদ করে দিয়ে ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছিলেন। সাতান্ন সালের আইন অনেক বেশি ব্যাপক ও কঠোর। শুধু সংবাদপত্র নয়; বই, পুস্তিকা, প্রচারপত্র, যা কিছু ছাপা হবে সবই আইনের আওতায় পড়ল। লেখক আদর্শবাদী হলে সরকারের বিরুদ্ধে লিখে সে শাস্তি বরণ করতে প্রস্তুত থাকতে পারে; এবং একটি বই বাজেয়াপ্ত হলে এমন বেশি ক্ষতি আর কি হবে? লেখক আত্মগোপন করে থাকলে তাকে ধরাও অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। সুতরাং সরকার সাহিত্যের উৎসমুখ ছাপাখানাগুলি নিয়ন্ত্রণ করলেন। ছাপাখানার মালিকের প্রধান উদ্দেশ্য ব্যবসা করা; যন্ত্রপাতি কিনে সে অর্থব্যয় করেছে—এসব ফেলে লেখকের মত সহজে আত্মগোপন করা সম্ভব নয়। শুধু মালিকই নয়, ছাপাখানার মাইনে-করা মুদ্রককেও আইন রেহাই দেয়নি। সুতরাং মালিক ও কর্মচারী অপরের লেখা বই ছাপিয়ে এত বড় বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করতে সম্মত হতে পারে না।

নাগরিক জীবনে এমন কঠোর নিয়ন্ত্রণের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র মত বিপ্লব-বিরোধী কাগজও 'পলাশীর শতবার্ষিকী' নামক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সাধারণভাবে সরকারের মৃদু সমালোচনা করায় আইন লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী হয়েছিল। 'বেঙ্গল হরকরা'ও সরকারের কোপদৃষ্টি এড়াতে পারেনি। অথচ এ-দুটি কাগজই বিপ্লবীদের কখনো সমর্থন করত না।

বাঙালী-পরিচালিত দ্বিভাষিক (বাংলা ও নাগরী) দৈনিক কাগজ 'সমাচার সুধাবর্ষণ' ১৮৫৪ সালের জুন মাসে শ্যামসুন্দর সেনের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। বাংলা ও হিন্দী এই দুই ভাষাতেই এই দৈনিক পত্রটি ছাপা হত। এটি

হিন্দী ভাষার প্রথম দৈনিক পত্রিকা। এই পত্রিকাটি প্রথম থেকেই বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে এবং তার ফলে তাকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। ২৬ মে (১৮৫৭) এই কাগজে মন্তব্য করা হয়: আমাদের শাসকরা আমাদের ধর্ম নষ্ট করতে উদ্যোগী হওয়ায় ঈশ্বর অবশ্যই তাঁদের উপর রুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হয় এবং এর ফলে তাঁরা যে সাম্রাজ্য হারাবেন, এটা মোটেই অসম্ভব নয়। ভৃত্য যখন প্রভুর আদেশের পালটা জবাব দেয়, তখন মৃত্যু সমাসন্ন বুঝতে হবে। সিপাহীরা জাতি হারাবার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে সরকারকে। এর ফল কি দাঁড়াবে, পাঠকরাই অনুমান করতে পারবেন। এক অশুভ মুহূর্তে গভর্নর দাঁত দিয়ে টোটা কাটবার আদেশ দিয়েছিলেন, এর ফলে সাম্রাজ্য রক্ষা করা তাঁর পক্ষে কঠিন হবে। গভর্নর এখন নানাভাবে সিপাহীদের আশ্বাস দিচ্ছেন, কিন্তু বিদ্রোহী সিপাহীরা তাঁর কথায় বিশ্বাস করে যুদ্ধ বন্ধ করবার লক্ষণ দেখাচ্ছে না; বরং তাদের বিদ্বেষ দিন-দিনই বেড়ে চলেছে এবং অনেক জায়গায় সিপাহীরা জনসাধারণকে তাদের দলে টানতে সক্ষম হয়েছে।

রেওয়ার রাজা গয়ার জাগ্রত দেবতা গদাধরের নিকট মানত করেছেন যে, যুদ্ধে ইংরেজদের হারাতে পারলে আড়াই লক্ষ টাকার পূজা দেবেন। পুরোহিতরা রাজার জয় কামনা করে পূজা করছে।

…সরকার আদেশ করেছেন যে, ব্যবসায়ীদের যুদ্ধে সাহায্য করতে হবে। ব্যবসায়ীরা এর ফলে খুব বিপদে পড়ে গেছে।

এই পত্রিকা ৫ জুনের সংখ্যায় লিখছে: দিল্লী ও মীরাটের বিদ্রোহ গভর্নরকে ভীতি-বিহ্বল করেছে। তিনি তাঁর দেহরক্ষীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে চব্বিশ জন নতুন লোক নিযুক্ত করেছেন। রাত্রি আটটার পর রাজভবনের সকল প্রবেশ-পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়; তারপর যিনি যত বড় প্রয়োজনেই আসুন না কেন, কিছুতেই দরজা খোলা হয় না। গভর্নর প্রত্যহ দমদম, ব্যারাকপুর প্রভৃতি স্থানের সেনাশিবিরে গিয়ে সিপাহীদের সেলাম করে মধুর ভাষায় বলেন, 'তোমাদের ধর্ম-বিশ্বাসে আঘাত লাগাবার মত কোনো কাজ আমি আর করব না; ধর্মানুষ্ঠানের জন্য তোমাদের যা করা প্রয়োজন তা তোমরা অবাধে করে যাও, কেউ বাধা দেবে না।'…সিপাহীরা গভর্নরের কথায় আস্থা স্থাপন করবে বলে মনে হয় না।

সাতান্ন সালের বিপ্লবের পটভূমিকায় বাঙালীর আচরণের বিচার করতে গিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত ও তাঁর 'সংবাদপ্রভাকর'কেই নজির হিসাবে উপস্থিত করা হয় দেখেছি। 'সমাচার সুধাবর্ষণে'র উল্লেখ চোখে পড়েনি। তার কারণ হয়ত এই যে, যে-সব

পুথিপত্র রাজরোষে পড়ে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, তাদের কোনো কপি এখন পাওয়া যায় না। 'সমাচার সুধাবর্ষণে'র সংশ্লিষ্ট সংখ্যাগুলি আমিও দেখতে পাইনি। এই পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত 'আপত্তিকর' মন্তব্যগুলি সরকারের পক্ষ থেকে ইংরেজী অনুবাদ করা হয়েছিল। তারই বাংলা মর্মানুবাদ এখানে দিয়েছি।

হোম ডিপার্টমেন্টের ১২ জুনের (১৮৫৭) রেজলিউশানে 'সমাচার সুধাবর্ষণ' ও 'দূরবীণ'-এর (ফারসী কাগজ) মুদ্রাকর ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট জারি করে তাদের বিচারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে উপস্থিত করবার নির্দেশ দেওয়া হয়। ঐ রেজলিউশানেই মুদ্রাযন্ত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বিল রচনা করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরদিন ১৩ জুন Suppression of the Press Act (No. 15 of 1857) পাশ হয়ে যায়। এমন ত্রস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মূলে ছিল 'সমাচার সুধাবর্ষণে'র সরকারবিরোধী তীব্র মন্তব্য। 'দূরবীণ' বিপ্লবীদের একটি ইস্তাহার শুধু প্রকাশ করেছিল এবং অভিযোগ উত্থাপন করবার পর 'দূরবীণ'-পক্ষ থেকে সরকারবিরোধী কাজের জন্য দুঃখপ্রকাশ করা হয়। 'সমাচার সুধাবর্ষণে'র সম্পাদক শ্যামসুন্দর সেন দুঃখপ্রকাশ করেননি। জুলাই মাসের শেষের দিকে সুপ্রীম কোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার হয়। সারাদিন ধরে অভিযোগের মামলার শুনানী চলে। বিচারে সম্পাদক মুক্তিলাভ করেন। শাস্তি না হবার কারণ এই যে, 'সমাচার সুধাবর্ষণে' সরকারবিরোধী মন্তব্য প্রকাশের সময় মুদ্রাযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের কঠোর ধারা বলবৎ ছিল না। সম্পাদক মুক্তি পেলেও কাগজ আর প্রকাশিত হয়নি বলেই মনে হয়। এরপরে যে 'সমাচার সুধাবর্ষণ' বেরিয়েছিল, তার কোনো প্রমাণ নেই। নতুন আইন অনুসারে লাইসেন্স নিয়ে মুদ্রাযন্ত্র ব্যবহার করতে হত। লাইসেন্স দেবার পূর্বে পুলিশ কমিশনার আবেদনকারীর চরিত্র, রাজনৈতিক মতামত ইত্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করত। শ্যামসুন্দর সেন নিশ্চয়ই লাইসেন্স পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হননি।

সরকারী আদেশে কলকাতার একটি লিথোগ্রাফিক প্রেস বাজেয়াপ্ত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর-একটি সংবাদপত্রও রাজরোষে পড়েছিল। লঙ সাহেব তাঁর রিপোর্টে এসব কিছুই উল্লেখ করেননি।

কলকাতা তখন ভারতের রাজধানী ছিল বলে মুদ্রাযন্ত্র নিয়ন্ত্রণের আইন এখানে কঠোরভাবে যাতে পালন করা হয় সেদিকে সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। বাঙালী অস্ত্র ধরেনি বটে, কিন্তু তার কলমকে সরকার সন্দেহের চোখে দেখতেন। গভর্নমেন্টের সন্দেহ হয়েছিল বাঙালীর লেখা পুথিপত্র থেকে বিপ্লবের বাণী প্রচারিত

হয়েছে। তাই সরকার লঙ সাহেবকে ১৮৫৭ সালে কলকাতায় প্রকাশিত পুথিপত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দেবার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, মীরাট, কানপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বিপ্লবের প্রবলতা সত্ত্বেও সেইসব স্থানে এরূপ তথ্যানুসন্ধানের ব্যবস্থা করা হয়নি।

১৮৫৯ সালে লঙ সাহেব ১৮৫৭ সালের প্রকাশন সম্বন্ধে এক বিস্তৃত রিপোর্ট দাখিল করেন। পুথিপত্র এবং মুদ্রাযন্ত্রের দপ্তর পরীক্ষা করে তিনি রাজদ্রোহের কোনো পরিচয় পাননি। রাজনীতি-সম্বন্ধীয় একটিমাত্র বই ঐ বছর বেরিয়েছিল, তার নাম 'রাজভক্তে'। নাম থেকেই বইটির বিষয় বোঝা যায়। লঙ সাহেবের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্টে 'সমাচার সুধাবর্ষণে'র বিপ্লব সমর্থন এবং গভর্নমেণ্ট কর্তৃক শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কোনো উল্লেখ নেই দেখে সন্দেহ হয় যে, বিশেষ কোনো কারণে (হয়ত সরকারের নির্দেশে) রাজদ্রোহমূলক পুথিপত্রের কথা তিনি বলেননি। 'সমাচার সুধাবর্ষণে'র মত অন্যান্য পত্রিকা এবং পুস্তক সরকার-বিরোধী মন্তব্য প্রকাশ করায় হয়ত লঙ সাহেবের রিপোর্টে অনুল্লিখিত আছে এবং আজ তাদের সম্বন্ধে আমাদের কোনো সংবাদ জানবার উপায় পর্যন্ত নেই।

লঙ সাহেব এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত পুথিপত্রের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সরকারের ওয়াকিবহাল থাকা কর্তব্য। তা থেকে ভারতবাসীর চিন্তাধারার গতিপ্রকৃতি জানা যাবে। লঙ সাহেব বলছেন: "Had the Delhi native newspapers of January 1857 been consulted by European functionaries, they would have seen in them how the natives were rife for revolt, and were expecting aid from Persia and Russia."

এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ১৮৫৭ সালের ১৫নং আইন সংশোধন করে 'প্রেস অ্যাণ্ড রেজিস্ট্রেশান অব বুক্স্ অ্যাক্ট, ১৮৬৭' পাশ করানো হয়। এই আইন অনুসারে এখনো মুদ্রাযন্ত্রের উপরে নিয়ন্ত্রণ বজায় রয়েছে। সাতান্ন সালের বিপ্লবের সঙ্গে এই আইনটি এখনো যোগসূত্র রক্ষা করে চলেছে। তদানীন্তন সরকার এবং লঙ সাহেব ভারতীয় প্রকাশন সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে যা করা উচিত বলে ভেবেছিলেন, 'প্রেস অ্যাণ্ড রেজিস্ট্রেশান অব বুক্স্ অ্যাক্ট'-এর সাহায্যে আজও মোটামুটি সেই কাজই করা হয়। পরোক্ষে এই আইন আমাদের দুটি উপকার করেছে। প্রথমত, আইনের ধারা অনুসারে সংগৃহীত পুথিপত্র নিয়মিতভাবে ১৮৬৭ সাল থেকে ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে রাখা হয়েছে।

প্রয়োজন হলে এসব বইপত্রের সাহায্য সেখান থেকে পাওয়া যায়। না-হলে তো একেবারেই হারিয়ে যেত। দ্বিতীয়ত, প্রেস থেকে বাধ্যতামূলকভাবে যেসব পুঁথিপত্র সরকারী দপ্তরে জমা দেওয়া হয়েছে, ১৮৬৭ সাল থেকে তাদের একটি ত্রৈমাসিক তালিকা প্রকাশ করায় গবেষকদের খুবই উপকার হয়েছে।

মুদ্রাযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে বুদ্ধিজীবীদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল। ১৮৫৮ সালের ১০ নং আইন দ্বারা সর্বশ্রেণীর লোকের উপর অত্যাচার করবার আশঙ্কা স্পষ্ট হল। কোনো গ্রামবাসী যদি বিপ্লবে যোগ দিয়েছে বলে ম্যাজিস্ট্রেট সন্দেহ করে, অথবা কোনো গ্রাম যদি বিপ্লবীকে আশ্রয় দিয়েছে বলে জানা যায়, তাহলে গ্রামবাসীদের উপরে পাইকারি জরিমানা ধার্য করা হবে। অপরাধী কিংবা অপরাধের নির্দিষ্ট প্রমাণের প্রয়োজন নেই। জমিদার তার এলাকায় বিপ্লব দমনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে—তার প্রমাণ দিতে না পারলে জমিদারী বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে, অধিকন্তু জরিমানাও হতে পারে। গ্রামাঞ্চলের কর্মচারীরাও যদি প্রমাণ করতে না পারে যে বিপ্লব দমনের জন্য তারা যথাসাধ্য করছে, তাহলে তাদেরও চাকরি যাবে। ম্যাজিস্ট্রেটের অভিমতই চরম বলে গ্রাহ্য, কোনো আপীল নেই। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে জরিমানা আদায় করবার ক্ষমতা ম্যাজিস্ট্রেটকে দেওয়া হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের ১ মে থেকে এই আইনের ধারা বলবৎ করা হয়।

১৮৫৭ সালে বাংলাদেশের সুদূর মফস্বল পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যত্র তা হয়নি। এইজন্য শাস্তিমূলক আইনগুলি বাংলাদেশের নবোদ্ভূত মধ্যবিত্ত ও জমিদার শ্রেণীকে যতটা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিল, শিথিল-শাসিত অঞ্চলে তা সম্ভব হয়নি।

'লণ্ডন টাইমস'-এর সংবাদদাতা উইলিয়াম রাসেল বিপ্লবের পরবর্তী অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে লিখেছিলেন: "...Many years must elapse ere the evil passions excited by these disturbances expire; perhaps confidence will never be restored; and, if so, our reign in India will be maintained at the cost of suffering which it is feared to contemplate."

পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতবাসী প্রভূত দুঃখকষ্ট সয়েছে; মুদ্রাযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ এবং পাইকারি জরিমানা ইত্যাদি অত্যাচারের দুটি প্রধান অস্ত্র ছিল। সাতান্ন সালের বিপ্লব উপলক্ষে এ-দুটির সূত্রপাত হয়।

সাতান্ন সালের বিপ্লব বুদ্ধিজীবী বাঙালীর মনে পরোক্ষে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি

করেছিল এবং এই প্রভাবের ছাপ পড়েছিল বিপ্লবোত্তর বাংলা সাহিত্যে। আটান্ন সাল থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্য যেন হঠাৎ সাবালকত্ব লাভ করল। এতদিন সাহিত্যের পথ প্রস্তুত করা হয়েছে, উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি কিছু হয়নি। বিপ্লবের প্রচণ্ড আঘাত মনের দিগন্ত ও সৃষ্টির ক্ষমতাকে প্রসারিত করে দিল। হিন্দু কলেজ স্থাপিত হবার চল্লিশ বছর পরে বিপ্লব শুরু হয়। এই চল্লিশ বছরে আমরা যা করতে পারিনি, বিপ্লবের পরে দশ-পনেরো বছরের মধ্যে তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ হয়েছে এবং এর প্রভাব আমাদের জাতীয় জীবনে স্থায়িত্ব লাভ করেছে। রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি লেখকরা পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী রচনা করে দেশপ্রেম, বীরত্ব ও আত্মত্যাগকে প্রাধান্য দিলেন। বিপ্লবের আত্মা তাঁদের রচনায় বেঁচে রইল। একমাত্র দীনবন্ধু বর্তমান সমস্যা নিয়ে 'নীলদর্পণ' রচনা করলেন। সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে কিছু লেখায় বিপদের আশঙ্কা ছিল। তাই অধিকাংশ লেখকই ইতিহাস এবং পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

শুধু সাহিত্যে নয়, সাংবাদিকতা, রাজনীতি, বিজ্ঞানচর্চা ইত্যাদি বিষয়ে বিপ্লবোত্তর পনেরো বছরের মধ্যে আমাদের জীবনে নবযুগের সূচনা হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে নবগোপাল মিত্রের 'হিন্দু মেলা' প্রতিষ্ঠিত হয়। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'বঙ্গদর্শন' প্রথম প্রকাশিত হয় এই সময়। 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশান অব সায়েন্স'-এর সূত্রপাতও হয়েছিল বিপ্লবের বছর বারো পরে। বিপ্লবের অব্যবহিত পর থেকে বাঙালীর চিন্তায় ও কর্মে এক নতুন জোয়ার এসেছিল। সমগ্র দেশ তার ফলে উপকৃত হয়েছে।

নীলকর সাহেবদের সঙ্গে চাষীদের বিরোধ অনেকদিন ধরেই চলে আসছিল। সেই বিরোধ ব্যাপক বিদ্রোহ হয়ে আত্মপ্রকাশ করে ১৮৫৯ সালে। এর মধ্যেও সাতান্ন সালের বিপ্লবের পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে এমনিতেই লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তার উপর বিপ্লব শুরু হবার পর এদের অনেককে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেবার ফলে অত্যাচারের মাত্রা চরমে উঠে সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল। তার জন্যে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ত্বরান্বিত হয়েছে।

দিল্লীর শেষ মুসলমান সম্রাটকে কেন্দ্র করে প্রধানত মুসলমানরাই ইংরেজ তাড়াবার জন্য উদ্যোগী হয়েছে—ব্রিটিশ শাসকদের মনে এমনি একটি ধারণা জন্মেছিল। তাই মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি কিছুকাল যাবৎ ইংরেজরা বিমুখ ছিল। বিপ্লবের সময় হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যটাও তাদের ভাল লাগেনি। অল্প-

সংখ্যক সৈন্য নিয়ে এদেশে প্রভুত্ব বজায় রাখতে হলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ যে অত্যাবশ্যক, তা ইংরেজরা বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারে। তাই বিপ্লবের অব্যবহিত পরে ইংরেজরা সহানুভূতি দেখাত হিন্দুদের প্রতি। লর্ড এলেনবরো সরকারী দলিলে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন : "The race (of Muslims) was fundamentally hostile to us and our true policy is to reconciliate the Hindus."

হিন্দুরা যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে দাঁড়াল, তখন সরকার মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে লাগলেন। এই ভেদনীতির ফল আমাদের পক্ষে যে কিরূপ মারাত্মক হয়েছে তা আমরা জানি।

ডঃ সৈয়দ মামুদ বলেন যে, ১৮৫৭ সালের পূর্বে উর্দু ছিল ভারতের বেসরকারী রাষ্ট্রভাষা। উত্তর ভারতের বৃহৎ অঞ্চলে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও আদালতের ও শিক্ষার ভাষা ছিল উর্দু। বিপ্লবের পূর্বে ভাষা হিসাবে হিন্দীর স্থান ছিল নগণ্য। ব্রিটিশ কর্মচারীরা মুসলমান বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে উর্দুর বিরোধিতা করতে শুরু করল। সাতান্ন সালের পরে হিন্দীর পক্ষ অবলম্বন করে ইংরেজ কর্মচারীরা পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে শুরু করে। ইংরেজ সিভিলিয়ানরা হিন্দী ব্যাকরণ, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি রচনা করে হিন্দীর চর্চা অনেকটা যেন জোর করে লোকের উপর চাপিয়ে দিতে লাগল। গভর্নর থেকে সাধারণ ইংরেজ সিভিলিয়ান—সকলেরই বহুদিন যাবৎ স্কুলে-আদালতে প্রচলিত উর্দুকে হটিয়ে হিন্দী প্রচলনের জন্য ছিল অশোভন উৎসাহ। হিন্দী-উর্দুর এই বিরোধের ফল ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি ; তা সাম্প্রদায়িকতাকে তীব্রতর করতে সহায়তা করেছে। সাতান্ন সালের বিপ্লব পরোক্ষে যদি হিন্দী ভাষার শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য না করত, তাহলে আজ রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা কার ভাগ্যে জুটত, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

সাতান্ন সালের বিপ্লবের একটি প্রত্যক্ষ ফল হল ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের সামাজিক সম্পর্কের বিচ্ছেদ। সাতান্ন সাল পর্যন্ত সকলের সঙ্গে না হলেও উচ্চশ্রেণীর এবং শিক্ষিত ভারতীয়দের সহিত অনেক ইংরেজেরই ঘনিষ্ঠতা ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে শুরু করে কোম্পানীর সাধারণ কর্মচারী—প্রত্যেকেই বাঙালী বাড়ির বিয়ে, দুর্গোৎসব ইত্যাদিতে সানন্দে যোগ দিতেন। বাইজী, গড়গড়া, দিবানিদ্রা ও পালকি ইংরেজরা সহজভাবেই গ্রহণ করেছিল। শ্যামবাজার, বাগবাজার, বেলগাছিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বাঙালীদের থিয়েটারে গভর্নর ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং অন্য ইংরেজ নাগরিকরা দর্শক হিসাবে উপস্থিত থাকতেন। শিক্ষা ও সমাজসেবা-

মূলক যত প্রতিষ্ঠান উনবিংশ শতাব্দীতে স্থাপিত হয়েছিল, তাদের সঙ্গে য়ুরোপীয় ও ভারতীয়েরা সমানভাবে যুক্ত থাকতেন। উভয়ের উদ্যোগে এইসব প্রতিষ্ঠান কাজ করত। ইংরেজরা ভারতীয়দের উপেক্ষা করত না। উভয়েরই অধিকার ছিল সমান। ইংরেজ ও ভারতীয়দের ঘনিষ্ঠ সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে পুঁথিপত্রে এত প্রচুর প্রমাণ রয়েছে যে, বাহুল্যবোধে এখানে দৃষ্টান্ত দেওয়া হল না।

সাতান্ন সালের বিপ্লব জাতিবিদ্বেষের জন্ম দিল। ভারতীয় ও ইংরেজ—এই দুটি পক্ষ তখন থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও বিদ্বেষের ফলে সামাজিক সৌহার্দ্য ধীরে ধীরে প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। এই কলকাতা শহরেই সাহেবপাড়া ও বাঙালীপাড়া সুনির্দিষ্টভাবে গড়ে উঠল।

কোম্পানীর হাত থেকে খাস ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের অধীনে ভারত চলে যাবার ফলেও সামাজিক আদান-প্রদানের প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়েছিল। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংরেজ জাতির প্রতিনিধি নয়; ভারত কোম্পানীর জমিদারী, ব্রিটিশ জাতির সম্পত্তি নয়। সুতরাং কোম্পানীর শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মিশনারী, ব্যবসায়ী এবং কোম্পানীর কর্মচারী ছাড়া অন্যান্য ইংরেজ ভারতবাসীর সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে। কোম্পানীর শাসন শেষ হবার পর ভারত হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ; প্রত্যেক ইংরেজের মনে জাগল ভারত সম্বন্ধে অধিকারবোধ। সরকারী কর্মচারী হোক আর না-ই হোক, সব ইংরেজ শাসকের দলভুক্ত হল, আমরা হলাম শাসিত। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সমালোচনা করলে সেটা প্রত্যেক ইংরেজকেই স্পর্শ করে। সুতরাং সদ্য-সমাপ্ত বিপ্লবের পটভূমিকায় শাসক ও শাসিতের মধ্যে সামাজিক আদান-প্রদান বেশিদিন সম্ভব হল না।

ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেবার ফলেই সিপাহীরা ক্রুদ্ধ হয়েছিল—ব্রিটিশ শাসকদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। এদেশের লোকেও তা বিশ্বাস করত। 'হুতোম প্যাচার নকশা'র লেখক বলছেন: "খাঁটি হিন্দু (অনেকেই দিনের বেলায় খাঁটি হিন্দু) দলে রটিয়ে দিলে যে বিধবা-বিবাহের আইন পাশ ও বিধবা-বিবাহ হওয়াতেই সেপাইরে ক্ষেপেচে। গভর্নমেণ্ট বিধবা-বিবাহের আইন তুলে দিয়েছেন—বিদ্যাসাগরের কর্ম গিয়েছে···প্রথম বিধবা-বিবাহের বর শিরীষের ফাঁসি হবে।" সুতরাং ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেই ভিক্টোরিয়া আশ্বাস দিলেন যে, ভারতবাসীর ধর্মবিশ্বাসে ভবিষ্যতে কখনো আঘাত দেওয়া হবে না। পাছে নতুন বিপ্লব শুরু হয়, এই আশঙ্কায় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রের এই শর্তটি বিশেষ সতর্কতার সহিত পালন করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে উল্লেখযোগ্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারগুলি সাতান্ন সালের পূর্বেই হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বিধবা বিবাহ আইনানুগ করা, দেশীয় শিক্ষার পরিবর্তে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন, কলকাতা-বোম্বাই-মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ ইত্যাদি প্রধান সংস্কারগুলি কোম্পানীর আমলেই হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবল বিরোধিতা ছিল। কিন্তু কোম্পানী প্রগতিশীল সংস্কার করবার জন্য জনমতকে উপেক্ষা করতেও দ্বিধা করেননি। সতীদাহ সমর্থন করে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার বহু লোক আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছে। এই আবেদন বিলাতে পাঠিয়ে এবং ব্যারিস্টার নিযুক্ত করেও কোনো সুবিধা হয়নি। রামমোহন প্রমুখ প্রগতিশীল সংস্কারকদের কথা শুনে কোম্পানী আইন পাশ করেছে।

ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবার পর সরকারের সংস্কার-বিমুখতা লক্ষণীয়। সাতান্ন সালের পর থেকে ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগে সতীদাহ নিবারণ কিংবা বিধবা-বিবাহ আইনসিদ্ধ করবার মত উল্লেখযোগ্য সংস্কার কিছু হয়নি। অথচ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক বৃহৎ সংস্কার অত্যাবশ্যক ছিল। আইন পরিষদে যখন ভারতীয় সভ্যরা প্রবেশের অধিকার পেল, তখন তারা কিছু কিছু সংস্কারের চেষ্টা করেছে। জনপ্রতিনিধিরা সংস্কারে উদ্যোগী হলে সরকারের দায়িত্ব কমে। তথাপি ভারতবাসীর চিরাগত সংস্কারে আঘাত দিয়ে পাছে নতুন কোনো গণবিক্ষোভ জেগে ওঠে, এই ভয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সতর্কতার অন্ত ছিল না। শুধু সতর্কতা নয়, রীতিমত আশঙ্কা। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত সংস্কার প্রস্তাবগুলি সরকারের উপর কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তা পর্যালোচনা করলেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। সেন্সাস সামাজিক সংস্কার নয়, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক তথ্য-সংগ্রহ মাত্র। বোম্বাই সরকার যখন সেন্সাস গ্রহণের প্রস্তাব প্রথম করলেন তখন ভারত সরকার এ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারেননি। ১৮৫৯ সালের ৬ এপ্রিল গভর্নর জেনারেল এ-সম্বন্ধে ভারত সচিবকে এক পত্র লেখেন। পত্রের মর্ম ছিল এই যে, গভর্নমেণ্ট নতুন কিছু করতে গেলেই লোকের মনে সন্দেহ জাগবে। তারা ভাববে যে, বুঝি সরকার-বিরোধীদের তালিকাভুক্ত করবার জন্য অথবা ট্যাক্স বৃদ্ধির জন্য লোকগণনার আয়োজন হয়েছে। শিক্ষিত লোকদেরও সন্দেহমুক্ত করা কঠিন হবে।

সুতরাং ভারতীয়দের মধ্যে সেন্সাস সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত গভর্নমেণ্ট লোকগণনা আরম্ভ করেননি।

শ্রীরামপুরের শ্রীনাথ দে '*Geography*' (in Bengali) নামে একটি বই ছাপিয়ে

মিঃ বাকল্যাণ্ডের নিকট সাহায্যের আবেদন করে। বাকল্যাণ্ড বইটি বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর মতামতের জন্য। ঈশ্বরচন্দ্র বইটিকে সাহায্যের জন্য সুপারিশ করতে পারলেন না দুটি কারণে। প্রথম কারণ, এর ভাষা; দ্বিতীয় কারণ হল: "There is, in addition, another serious objection to this book; in several places it reflects the notions on the subjects as inculcated in the religious books of the Hindus. I cannot therefore recommend its adoption as a classbook" গভর্নমেণ্ট এই রিপোর্ট স্বীকার করে নিলেন।

মিশনারীরা এই রিপোর্টের কথা জেনে খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তারা শ্লেষ করে বলে, তাহলে হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী ভূগোলে কি লেখা থাকবে যে বানারস পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল, এবং ক্ষীরসাগর, দুধসাগর প্রভৃতি সপ্তসাগরে পৃথিবী শোভিত? 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'য় মন্তব্য করা হল: এই ব্যাপার "demonstrates complete unfitness of natives for higher educational offices."

ঈশ্বরচন্দ্রের মতামতের যুক্তিবত্তা আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ধর্ম-সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারেই যে গভর্নমেণ্ট হস্তক্ষেপ করতে চাইতেন না, এটা তারই প্রমাণ। সাতান্ন সালের পরে গভর্নমেণ্টের নীতির পরিবর্তন এই দৃষ্টান্ত থেকে পাওয়া যাবে। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ক্ষোভের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের রিপোর্ট সম্বন্ধে মন্তব্য করছেন: "The Government of India have always had a tendency to submit their own consciences to native dictation in the matter."

ব্রেইলস্‌ফোর্ড তাঁর '*Subject India*' গ্রন্থে ব্রিটিশ সরকারের সংস্কারবিমুখতা সম্বন্ধে বলছেন: "Nonetheless, our official policy was then as now, to interfere as little as possible with Indian institutions: it tolerated social customs injurious to health notably child marriage and accepted even untouchability as an immutable fact in an environment it dared not alter. Our courts, as time went on, took to administering Hindu law with an almost antiquarian fidelity. The result of this attitude was unquestably to steriotype the past in a land that never has discared it with ease."

ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করবার সময় দেশীয় নৃপতিদের সঙ্গে স্থিতাবস্থা চুক্তি করে দেশের এক বৃহৎ অংশে সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করলেন। দেশীয় রাজ্যগুলির তথাকথিত স্বাধীনতা ভারতের রাষ্ট্রীয় সংহতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকতার প্রতিদানস্বরূপ দেশীয় নৃপতিরা স্বাধীনতা আন্দোলনের এবং সকল প্রকার প্রগতির বিরোধিতা করেছে। আটান্ন সালের চুক্তির উত্তরাধিকারী হিসাবে আজও আমাদের দেশীয় রাজ্যের জন্য খেসারত দিতে হয়।

সাতান্ন সালের বিপ্লবের পর সাম্রাজ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকারের সংস্কার-বিরোধী এবং সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্য বজায় রাখবার নীতি আমাদের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়েছে। আর্থিক শোষণ অপেক্ষাও এ-ক্ষতিটা মারাত্মক। লর্ড লিটন ১৮৭৬ সালে ঘোষণা করেছিলেন: "the crown of England should henceforth be identified with the hopes, the aspirations, the sympathies and the interests of a powerful native aristocracy."

এই নীতির ফলে মুষ্টিমেয় লোক পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে এবং সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় উপকৃত হয়েছে। মধ্যবিত্ত চাকরিজীবীরা নিজেদের চেষ্টায় এবং ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও চিন্তাধারাকে গ্রহণ করেছে। জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশ এখনো অশিক্ষা, কুসংস্কার ও দারিদ্র্যের মধ্যে ডুবে আছে। সরকার যখন সংস্কার ও সমাজকল্যাণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তখন তার প্রভাব দেশের প্রত্যেকের উপরেই পড়ে। আমাদের দেশে বিদেশী সরকার নিষ্ক্রিয় থাকায় সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজন নিজেদের সাংস্কৃতিক ও আর্থিক উন্নতির ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিয়েছে। এদের যতই নানামুখী প্রগতি হয়েছে, দেশের জনসাধারণ ততই ধীরে ধীরে দূরে সরে গেছে। আজ তাই দেখছি, পাশ্চাত্য শিক্ষায় অনুপ্রাণিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে দেশের বৃহত্তর সমাজের ভাবগত ঐক্য নেই। এর ফলে সুদৃঢ় একজাতীয়ত্ববোধ জাগতে বিলম্ব ঘটছে। বিপ্লবোত্তর নব্বই বছরের ব্রিটিশ শাসনের সবচেয়ে বড় কুফল জাতির মধ্যে এই ভাবগত বিভেদ সৃষ্টি।

ইংরেজরা এদেশে এসেছিল নতুন ভাবধারা, যন্ত্রকুশলতা ও সংগঠনশক্তি নিয়ে। দুর্বল ও অক্ষম শক্তির শাসনে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ইংরেজদের মধ্যে শক্তির বিকাশ দেখে তাদের ভাল লাগল; অক্ষমের কুশাসন থেকে মুক্তি পাবার আশায় ইংরেজদের তারা অভ্যর্থনা জানাতে দ্বিধা করেনি। ধীরে ধীরে

ইংরেজের শক্তির উপর এমন নির্ভরতা জাগল যে, তাদের বাদ দিয়ে আমাদের চলতে পারে—এই ধারণাও যেন আর রইল না। সাতান্ন সালের বিপ্লবীরা শতাব্দীসঞ্চিত জড়তার মোহ থেকে আমাদের জাগান। যাদের এতদিন শক্তির প্রতিভূ বলে মনে করা হয়েছে, দেখা গেল বিপ্লবের সম্মুখীন হয়ে তাদের কী প্রবল আতঙ্ক! ইংরেজের ভয়ের মধ্যেই আমরা পেলাম মুক্তির আশা। উপলব্ধি করলাম, দেশের লোক আন্তরিকভাবে বিরুদ্ধাচরণ করলে বিদেশী সরকার প্রবলতম শক্তির অধিকারী হয়েও দীর্ঘকাল প্রভুত্ব করতে পারে না। সেদিনকার বিপ্লবীরা ইংরেজদের ভারত থেকে তাড়াতে চেয়ে পারেনি। পারেনি তার কারণ তাদের সঙ্কল্পের পশ্চাতে সঙ্ঘবদ্ধতা ছিল না; তাছাড়া সঙ্কল্প সফল হবার মত উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হতেও তখনো বিলম্ব ছিল। তথাপি বিপ্লবী সিপাহীদের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগামীদের চিনতে ভুল করবার কারণ নেই। ব্রিটিশ সরকার ভুল করেনি। ১৮৫৭ সালের বিপ্লবীদের ভারতে বন্দী করে রাখাও বিপজ্জনক ভেবে আন্দামানে প্রথম বন্দীশালা স্থাপন করা হয়। সেই বন্দীশালায় পরবর্তী-কালের বহু স্বাধীনতাকামী ভারতীয়কে—বিশেষ করে বাংলার বিপ্লবীদের—জীবন কাটাতে হয়েছে।

সংযোজন

[এই প্রবন্ধে আমরা 'সমাচার সুধাবর্ষণ' থেকে আপত্তিকর অংশগুলির ইংরেজী অনুবাদের বাংলা ভাবানুবাদ দিয়েছি। এর ফলে মূল বক্তব্যের মর্ম সুস্পষ্ট নাও হতে পারে। সেইজন্যে সংশ্লিষ্ট অংশের ইংরেজী অনুবাদ এখানে দেওয়া হল।]

২৬ মে, ১৮৫৭: After affirming it has only been constant war that has made us prosper hitherto, and that our constant aggressions were not bad policy, the writer proceeds, "but now, from the way in which they (our rulers) have attempted to destroy religion, it seems that God is certainly displeased with them, and hence it is not improbable that they will lose

their empire." "When a servant gives answer to his master, death is not far off." It is clear that the sepoys have given an answer to their master upon the subject of the loss of their caste. Let our readers consider for themselves what is likely to follow. It was in an unlucky moment that the Governor passed the order for biting the cartridges, that he will not be able to effect his purpose is a trifle, but he will have difficulty in saving the empire. Now he takes every kind of oath, but the mutinous soldiers attach no credit to what he says, and show no inclinations to leave off fighting; on the contrary, their rage increases every day, and they have induced the people in many places to join them.

The Raja of Rewa promised the priests of the sacred Godhadhur at Gya 2½ lakhs of rupees if he should conquer in the war with the English, so the priests are praying God that he may be victorious.

The Emperors of France and Russia have made peace with the British Government upon condition that the country which the British have taken from them respectively is to be restored, but the orders of restoration have not yet issued. They will probably not long be delayed under present circumstances. Government has passed an order that all merchants are to assist in the war. The merchants are in great trouble about this.

All the country people round Agra are buying weapons and arms in every direction, saying, "If we die for it, we will fight with all our might against the English." Let us see what will come of it.

৫ জুন, ১৮৫৭ : The mutinies at Meerut and Delhi have filled

the mind of our Governor with fear ; he has therefore added 24 men to his body guard and has ordered the principal gate, and all the minor entrances at Government House to be closed punctually at eight o' clock, P. M. After the gates are closed, no one is admitted, no matter who he be, or what his business ; and he goes every day to Dum Dum, Barrackpore, & c., and salaming to the sepoys with both hands, with great address, addresses them thus, with sweet words : "I will never attempt any thing which can injure your religion. Do whatever your religion requires, no one shall prevent you." The members of the great Council of Parliament having understood that the order to bite the cartridages was at the bottom of all the present mutinies of the sepoys, had sent a letter of commands to Lord Canning. In it this is written, "Take means to make the Hindu and Mussulman sepoys abandon their mutinous conduct, or else it will be much the worse for you." When he got these orders, our Governor determined to buri all the cartridges with suspected covers (paper ?) in the presence of the sepoys all over the country, in order that they might lose all suspicion in regard to their religion and return to their allegiance, but it does not seem as if the sepoys would place any confidence in the word of the Governor.

৬ জুন, ১৮৫৭ : The foolish mutineers are using every means to drive the English from the country. They first wrote a number of letters to the several tributary Rajas of Ullwar, Rewa, Rampur, Bhurtpur, Puteyala, Gwalior, Kushmir, Nepal, &c. to come and assist them, but all of them, instead of leaving the English to join the sepoys, sent the letters to the British Government, and advanced with their forces to its assistance.

The ignorant sepoys despairing of obtaining any assistance in the north-west, then wrote a letter to the chief of the Sontal country to the effect that if they would give their aid and raise the Sontals again, they would very soon drive the English out of India.

The same paper contains a very favourable article upon the subject of the late meeting of the Hindus of Calcutta, dwelling especially with great satisfaction upon the assurances given by the Government in reply to the address of that meeting that it would ever respect the religion of its subjects.

৯ জুন, ১৮৫৭ : We learn by a letter from Lucnow that the zemindars of Tulsipur and Saltipur, and the country on the banks of the river Gogra, have collected a body of 60,000 sepoys and 1,12,000 of the country people to fight against the English, and sent a letter to the Nawab of Lucnow, in Calcutta, offering to drive the English out of the Province. But the Nawab would not give his consent, but on the contrary, actuated by fear, sent instructions to the zemindars to keep quiet. There is however, no doubt whatever that the zemindars will very soon create a fearful disturbance despite the commands of the Nawab. Our Governor is already very much alarmed at the revolt or the Delhi sepoys, and taking all kinds of precautions. He will have greater difficulty than ever in knowing what to do when the news of this Oudh under the British Government, we feel sure that the Lord of the world also will be favourable to them, and he whose honour is preserved by God need fear harm from no one. So let the Governor set his mind at ease and make arrange-

ments for fighting on all sides. He will surely gain the victory. Only let him abstain from interfering with the religion of the people, and all will go well.

পাঠপঞ্জী

১ ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় সংবাদপত্রের সংবাদ পরিবেশন এবং সম্পাদকীয় মন্তব্য সম্বন্ধে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সরকারী রিপোর্ট।

২ ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সংবাদপত্র থেকে সংগৃহীত সংশ্লিষ্ট অংশের সঙ্কলন। জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত।

৩ Mukharji, Somboo Chunder. *The Mutinies and the people ; or statements of native fidelity exhibited during the outbreak of 1857-58*, Calcutta 1859

পণ্ডিতের পাঁতি

অষ্টাদশ শতক এবং উনিশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত বাঙালী হিন্দুর জীবন সম্পূর্ণ-রূপে শাস্ত্রের অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। যুক্তি, মুক্তবুদ্ধি এবং মুক্তচিন্তার দ্বারা সেই অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করবার মত দুঃসাহস তখনও আমাদের হয়নি। রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের মত প্রবল ব্যক্তিত্বও শাস্ত্রের অনুশাসন লঙ্ঘন করতে পারেননি। সতীদাহ প্রথা নিবারণের প্রস্তাব যখন পাদরীরা এবং কয়েকজন ব্রিটিশ প্রশাসক কোম্পানীর নিকট পেশ করেছিলেন, তখন সরকারও শাস্ত্রকে অমান্য করবার মত সাহস দেখাতে পারেনি; তাই প্রথম পরামর্শ নেওয়া হয়েছিল অজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছে। জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, হিন্দুশাস্ত্রে সতীদাহ অবশ্য-পালনীয় কিনা। রামমোহন সতীদাহ নিবারণের জন্য যখন প্রস্তাব দেন তখন তিনিও শাস্ত্র থেকে বচন উদ্ধৃত করে দেখিয়েছিলেন যে, অনেক ক্ষেত্রে সতীদাহ বাধ্যতামূলক নয়।

বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য প্রচার করবার উদ্দেশ্যে প্রমাণ হিসাবে শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। শাস্ত্রের সমর্থন দেখাতে না পারলে হিন্দু সমাজ কোনো সংস্কারের প্রস্তাবই গ্রাহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না। তাই আমাদের সমাজ-সংস্কারকরা যুক্তি ও বুদ্ধির আবেদন অপেক্ষা শাস্ত্রের বচনকেই বড় করে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন।

শুধু বড় বড় সংস্কারের ক্ষেত্রে এরকমটি ঘটত, তা নয়। প্রাত্যহিক জীবনে অনেক ব্যাপারেই নানা সমস্যা শাস্ত্রের দ্বারা অথবা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের পাঁতি দিয়ে সমাধান করবার রীতি উনবিংশ শতকে ছিল। তারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হল।

ইংরেজী সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমাদের জীবনে কতকগুলি সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এর সঙ্গে ধর্ম ও চিরাগত সংস্কারের প্রশ্ন জড়িত। এইসব প্রশ্নকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, নতুন ধরনের সব সামাজিক সম্পর্ক দেখা দিল। দ্বিতীয়ত, জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এমন সব উপকরণের অনুপ্রবেশ ঘটল—যা পূর্বে ছিল না।

নতুন সম্পর্কের কথায় প্রথম আসা যাক। ইংরেজ আমলের আগে শিক্ষক হবার যোগ্যতা ছিল কেবল ব্রাহ্মণদের। সুতরাং তখন গুরুকে প্রণাম করে শ্রদ্ধা

জানাতে কোনো অসুবিধা ছিল না। কিন্তু ইংরেজ আমলে স্কুল-কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হতে লাগলেন সকল শ্রেণীর হিন্দু, খ্রীস্টান, মুসলমান প্রভৃতি। ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য গেল দূর হয়ে। এবং এইজন্যই সমস্যা দেখা দিল। পূর্বে ছাত্ররা নির্দ্বিধায় গুরুকে প্রণাম করত। উচ্চবর্ণের হিন্দু ছাত্ররা এখন কিভাবে শিক্ষকদের শ্রদ্ধা জানাবে? পায়ে হাত দিয়ে অন্য-ধর্মাবলম্বীকে অথবা অব্রাহ্মণকে প্রণাম করা রীতিবিরুদ্ধ। অথচ শিক্ষককে শ্রদ্ধা জানানো ছাত্রের পক্ষে অবশ্যকর্তব্য।

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও সমাজপতি এ-সম্বন্ধে যে বিধান দেবেন, সমাজ তা মেনে নেবে। রাজা, জমিদার, সমাজপতি, পত্রপত্রিকা বিধান দেবার আয়োজন করলেন। এই কাজটাকে তাঁরা জনসাধারণের সেবা হিসাবে মনে করতেন। বর্ধমানের রাজবাটি, শোভাবাজারের রাজসভা এবং সমগ্র বাংলার বহু কেন্দ্রে নানা সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে বিধান দেওয়া হত। জনসাধারণের মধ্যে এইসব বিধান প্রচার করবার জন্য প্রশ্নাবলী ও উত্তর ছাপা হয়েছিল। শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ পণ্ডিতদের বিচারে সন্তুষ্ট হয়ে একদিনেই এক লক্ষ টাকা দক্ষিণা দিয়েছিলেন। এই বিচারে অংশ নিয়েছিলেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ।

বর্ধমানের মহারাজা পণ্ডিতদের দিয়ে এই প্রশ্নটির বিচার করিয়েছিলেন: "শিক্ষাগুরু নীচজাতীয় হইলে তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারা যায় কিনা?" শুধু রাজসভার পণ্ডিতদের দিয়ে বিচার করানো হল না। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বড় বড় পণ্ডিতদের কাছে পাঁতি চেয়ে চিঠি লেখা হল। সকলের উত্তর বিচার-বিশ্লেষণ করে মহারাজা সিদ্ধান্ত করলেন: "নীচজাতীয় শিক্ষাগুরু যদিও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির প্রণম্য না হউন, তথাপি তাঁহার অভ্যুত্থানাদিরূপ সম্মান করিতে হইবে এবং জাতিবিশেষকে সেলামাদি করাও কর্তব্য।"

এই বিধানেই কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি। বর্তমান শতকের একেবারে গোড়ায় রবীন্দ্রনাথকে ঠিক এই প্রশ্ন করে বিধান চাওয়া হয়েছিল। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেও ঠাকুর পরিবার জাত্যাভিমান সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করতে পারেনি। সোমেন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথের পৈতা উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিতদের বসবার জন্য পৃথক জায়গা নির্দিষ্ট হয়েছিল। এই পৃথক ব্যবস্থার কথা বুঝতে না পেরে রাজনারায়ণ বসু অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন: "যেদিন উপনয়ন হয় সেইদিন যে দালানে ক্রিয়া হইতেছিল আমি···একেবারে সেই দালানে গিয়া বসি। আমি জানিতাম না যে শূদ্রে তথায় বসিতে পারিবে না এমন নিয়ম হইয়াছে। এরূপ নিয়ম হইয়াছে জানিলে আমি তথায় বসিতাম না।"

পারিবারিক সংস্কার রবীন্দ্রনাথও বেশ কিছুকাল অস্বীকার করতে পারেননি। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের বোর্ডিংয়ে খাবার সময় স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য মেনে আলাদা আলাদা পঙ্‌ক্তিতে ভোজন হত। একবার জাতিভেদ নিয়ে এক প্রবল সমস্যা দেখা দেয়। আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় নিয়ম হয়েছিল ছাত্ররা শিক্ষকদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করবে। শিক্ষক কুঞ্জলাল ঘোষকে নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। তিনি একে কায়স্থ, তাতে আবার আদি ব্রাহ্ম সমাজে দীক্ষিত। তাঁকে প্রণাম করা নিয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হল। সে উত্তেজনা এতই তীব্র যে, পত্নীশোকে কাতর কবিকে প্রশ্ন না করে উপায় ছিল না। মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয় ১৩০৯ সালের ৭ অগ্রহায়ণ (২৩ নভেম্বর ১৯০২)। রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলকাতা থেকে ১৯ অগ্রহায়ণ লিখছেন : "প্রণাম সম্বন্ধে আপনার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে তাহা উড়াইয়া দিবার নহে। যাহা হিন্দু সমাজ-বিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না। সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে, ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে, এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়।…সর্বাপেক্ষা ভাল হয় যদি কুঞ্জবাবুকে নিয়মিত অধ্যাপনার কার্য হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া যায়। তিনি যদি আহারাদির তত্ত্বাবধানেই বিশেষরূপে নিযুক্ত থাকেন তবে ছাত্রদের সহিত তাঁর গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ থাকে না। ব্রাহ্মণেতর ছাত্রেরা কি অব্রাহ্মণ গুরুর পাদস্পর্শ করিতে পারে না?"

আমাদের সমাজ ধর্মাশ্রিত। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের সমাজ সম্বন্ধে একথা বিশেষ করে প্রযোজ্য। সুতরাং শাস্ত্রের সমর্থন থাকলে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিল। যদি শাস্ত্র বিতর্কিত বিষয়ে নীরব থাকত, তাহলে অন্তত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল।

সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রবচন প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করায় বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বিদ্রূপ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি না করেই হয়ত একথা বলেছেন। শুধু কি বিদ্যাসাগর? রামমোহন এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সকল সমাজসেবীই শাস্ত্রের সমর্থন দিয়ে নিজেদের বক্তব্য জোরালো করতে চেয়েছিলেন। লৌকিক ধর্মের সামগ্রিক প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করা ব্যক্তির পক্ষে কঠিন ছিল। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবস্থাপত্রই ছিল মুক্তির ছাড়পত্র।

সতীদাহ এবং বিধবার যন্ত্রণা ইংরেজ আমলের বহু পূর্ব থেকেই ছিল।

রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর শাস্ত্রের সমর্থন প্রমাণ করে সংস্কার করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সংস্কারপীড়িত সমাজ শাস্ত্রের অনুমোদন ছাড়া কিছুই মেনে নেবে না। কিন্তু শাস্ত্র যখন লেখা হয়েছে তখন খ্রীস্টান গুরু ছিলেন না।

সংস্কৃত কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের বৃদ্ধ প্রপিতামহ মুনিরাম বিদ্যাবাগীশের টোলে একদিন এসে উপস্থিত হল পরমাসুন্দরী এক তরুণী। কয়েকদিন পূর্বে স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। জাতিতে তাঁতী। মুনিরামের কাছে তার প্রার্থনা : স্বামীর চিতায় আত্মাহুতির সপক্ষে ব্যবস্থা দিতে হবে। নবদ্বীপের পণ্ডিতরা বলেছেন, এমন ব্যবস্থা দেওয়া যায় না, কারণ কালবিলম্ব দোষ ঘটেছে। অর্থাৎ সহমরণ তো আর হচ্ছে না! স্বামীর দেহ আগেই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। মুনিরামও সেই দোষেরই উল্লেখ করলেন। যুবতী বলল : পণ্ডিতমশায়, স্বামীর মৃত্যুর সময় আমি তাঁর নিকটে ছিলাম না, সুতরাং সহমৃতা হতে পারিনি। এখন আমি বিধবা, কেউ রক্ষক নেই; এই রূপ-যৌবন নিয়ে সম্মানের সঙ্গে বাঁচা কঠিন। এর মধ্যেই সুবেদারের দৃষ্টি পড়েছে। এই যে এখানে এসেছি, সঙ্গে এসেছে সুবেদারের লোক। সুতরাং আপনি যে করে হোক একটা ব্যবস্থা দিন।

মুনিরাম তরুণীর অবস্থা উপলব্ধি করে আবার পুথি নিয়ে বসলেন। অনেক দেখেশুনে ব্যবস্থাপত্র দিলেন, স্বামীর চিতায় আগুন জ্বেলে আত্মাহুতি দিতে পারে তরুণী। সেই ব্যবস্থাপত্র হাতে নিয়ে আনন্দিত মনে তরুণী চলে গেল।

সম্মানরক্ষার জন্য সে হাসিমুখে আত্মবিসর্জন করতে প্রস্তুত। কিন্তু শাস্ত্রের সমর্থন না নিয়ে আত্মাহুতি দিলে আত্মহত্যার পাপ স্পর্শ করবে, আর তার ফলে যেতে হবে নরকে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবস্থাপত্র থাকলে পাপের আশঙ্কা নেই, বরং শাস্ত্রানুগ কাজ করায় পুণ্য সঞ্চয় করবে। এইজন্যই ব্যবস্থাপত্রের এত মূল্য।

হিন্দু সমাজে ধর্মান্তর গ্রহণ ও অসবর্ণ বিবাহ শুরু হওয়ায় নতুন সমস্যা দেখা দিল। কয়েকটি প্রশ্ন থেকে এই সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় :

১) মা-বাবা ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করলে তাঁদের প্রণাম করা যায় কিনা এবং তাঁদের মৃত্যু হলে অশৌচ হবে কিনা। পণ্ডিতেরা বিধান দিলেন : তাঁরা প্রণম্য নন এবং তাঁদের মৃত্যুতে অশৌচ হবে না। কিন্তু অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়।

২) কেউ যদি পুত্রকে নীচকুলে বিয়ে দেয় এবং সেই পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে সংসার করে—তাহলে অন্য পুত্ররা পতিত হবে কিনা। এক্ষেত্রে বিধান হল : অন্য পুত্রদের পতিত হবার কারণ নেই এবং পিতার মৃত্যুতে অশৌচ পালন করতে হবে না। মেয়ের অসবর্ণ বিয়ের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যবস্থা।

যেসব হিন্দু খ্রীস্টান বা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে তাদের আবার স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য পতিতোদ্ধার সভা স্থাপিত হয়েছিল গত শতকের মধ্যভাগে। রাজা রাধাকান্ত দেব এ-ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে বাংলাদেশের পণ্ডিতদের কাছ থেকে পাঁতি এনেছিলেন। প্রায়শ্চিত্ত করে আবার হিন্দুধর্মে ফিরে আসা যাবে বলে বিধান দেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত খ্রীস্টান মিশনারীদের প্রচারকার্যে প্রচণ্ড আঘাত হানল। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের এতবড় উদারতা দেখে ৫ জুন ১৮৫১ তারিখের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' মন্তব্য করে: "ওয়ান অব দি মোস্ট ইম্পারটেন্ট ইভেন্টস্ দ্যাট হ্যাজ অকারড্ ইন ইণ্ডিয়া ইন দি প্রেসেন্ট সেঞ্চুরি।" পণ্ডিতদের পাঁতি সঙ্কলন করে ছাপানো হয়েছিল ১৭৭৫ শকে, পতিতোদ্ধার সভার উদ্যোগে।

পুজো-অর্চনা গঙ্গাজল ছাড়া চলত না। বিশেষ করে কলকাতা ও গঙ্গার নিকটবর্তী অঞ্চলে। বড়লোকের বাড়িতে গঙ্গাজল সঞ্চয় করে রাখা হত। গঙ্গা থেকে প্রচুর পরিমাণে জল এনে জালা ভর্তি করে রাখা ছিল এক সমস্যা। কেমন করে আনা যায়? ঘোড়ার গাড়ির চালকদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান। তাদের স্পর্শে যদি গঙ্গাজল অশুচি না হয়, তাহলে গাড়ি করে আনা সবচেয়ে সুবিধাজনক। সুতরাং অধ্যাপক পণ্ডিতদের কাছে মতামত জিজ্ঞাসা করা হল: গঙ্গাজল যবনস্পর্শে অপবিত্র হয় কিনা?

গঙ্গাজল কিছুতেই অপবিত্র হয় না—এই ধারণা দূর হল পণ্ডিতদের উত্তর পেয়ে। তাঁরা বললেন: "উদ্ধৃত গঙ্গাজল যবনস্পর্শে অপবিত্র হয়।"

কলকাতায় যখন কলের জল সরবরাহ আরম্ভ হল, তখন দেখা দিল প্রবল আন্দোলন। রাজা কালীকৃষ্ণ দেব পণ্ডিতদের আহ্বান করে সিদ্ধান্ত জানতে চাইলেন। সভায় কালীকৃষ্ণ বললেন: কলকাতায় কলেরা মহামারী হিসাবে দেখা দিয়েছে। এর প্রধান কারণ পরিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব। তাঁর নিজের কথা তুলে দিচ্ছি: "সেই বিলাসজনক জীবন নাশ নিবারণ কারণ কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি প্রচুর অর্থ ব্যয়ে ও অসাধারণ আয়াস সহকারে উৎকৃষ্ট যন্ত্রোদ্ধৃত জল সমানীত করিয়াছেন। পণ্ডিতগণ কহেন, এই বারিতে গঙ্গাত্ব নাই, সে যাহা হউক, আমি সমস্ত মহামহোপাধ্যায়গণের সহিত নানা প্রকার তর্কবিতর্ক করিয়া মীমাংসা করিয়া মীমাংসা করিতেছি যে, এই জল দৈব ও পিতৃকার্যে ব্যবহৃত না হইয়া শরীর রক্ষার নিমিত্ত জনপদে সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য, তাহাতে কিছুমাত্র দোষ দেখি না।"

যেসব কারণে কলের জলের প্রতি সাধারণ লোকের মন বিরূপ, তাদের

আলোচনা করে কালীকৃষ্ণ বলেছেন : "...স্তম্ভমধ্যে যন্ত্রান্তর্গত যে চর্মবৎ বর্তুলাকার ক্ষুদ্র বস্তু, চাক্তি সংযোজিত আছে তা টালাস্থ যন্ত্রাধ্যক্ষ সাহেব দ্বারা শ্রবণ, বীক্ষণ ও স্পর্শন করত ঐ বস্তু বৃক্ষবিশেষের রস (আটা বা গঁদ) দ্বারা নির্মিত বলিয়া সাব্যস্ত হইল, বাস্তবিক উহা চর্ম নহে, উহাকে রবর কহিয়া থাকে...স্পর্শদোষ বর্তে না।

এতদ্বিধায়িণী অপবিত্র অন্য কোন সামগ্রী জলনিঃসৃত প্রধান চোঙ্গের সহিত সংলগ্ন আছে কিনা, ইহা অবধারণ করিবার নিমিত্ত ধর্মোৎসাহী ভদ্রজনত্রয় সহিত সম্প্রতি আমি টালা নামক স্থানে গমনপূর্বক সমস্ত যন্ত্রের পরিচালন দর্শনে এবং কলিকাতার জাস্টিস সমাজের প্রধান শ্রীমান হগ সাহেবের আদেশে তত্রত্য যন্ত্রাধ্যক্ষ সাহেব সন্নিধানে যন্ত্রবিবরণাকর্ণনে হইল, কারণ প্রায় সমস্ত যন্ত্রেই বিশেষতঃ জল-সংস্রবী কলে কেবল নারিকেল তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।...বহুতর ব্যয়ে এই অমৃত তুল্যামৃত লাভ করিয়াও কেবল সন্দিগ্ধচিত্তে গ্রহণ না করা কেবল বুদ্ধিমত্তার ক্ষতি মাত্র।"

ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন সভায় ব্যবস্থা পাঠ করলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত হল যে, কুয়া ও পুষ্করিণী বিধর্মী এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুরা খনন করে। কিন্তু তাদের জল পান তো বর্ণহিন্দুরাও করে। সুতরাং কলের জল পান করলেও পতিত হবার প্রশ্ন ওঠে না। অবশ্য কলের জল পূজা ইত্যাদি কাজে ব্যবহারের অযোগ্য। সেসব কাজে গঙ্গা-জলই ব্যবহার করতে হবে। আজ পর্যন্ত আমরা পূজাকার্যে গঙ্গাজল ব্যবহারের সিদ্ধান্ত মেনে চলেছি।

ব্যাপারটা এখানেই মেটেনি। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতি সিদ্ধান্ত প্রচার করলেন : হিমখণ্ড (বরফ) ও সোডাওয়াটারের মত কলের জলও অশুচি। সভায় তাঁকে মতপ্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়নি। যে জল পূজা-অর্চনায় ব্যবহার করা যায় না, সে জল পানের অযোগ্য। কারণ শাস্ত্রকার বলেছেন, দেবতাকে নিবেদন না করে যে জল পান করা হয় তা মূত্রতুল্য অপবিত্র।

সংস্কৃত কলেজের আর-একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ কলের জলের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেছেন, কলের জল ব্যবহার আরম্ভ হবার পূর্বে তাঁর মৃত্যু অথবা দেশত্যাগ হলে ভাল হবে। কলকাতা ত্যাগ করে তিনি কাশী গিয়েছিলেন এবং সেখানেই কলেরায় তাঁর মৃত্যু হয়।

রাজা কালীকৃষ্ণের ধর্মসভাতেই প্রশ্ন এসেছিল মেদিনীপুর জেলার পাথরা নিবাসী মধুসূদন মজুমদারের কাছ থেকে। তাঁর প্রশ্ন ছিল : "বিধবা রমণী শংকট রোগে সমাক্রান্ত হইয়া পূর্ণবিকার প্রাপ্ত হইলে একাদশী দিনে বৈদ্য ও বান্ধবগণ তাহাকে

ঔষধ সেবন না করাইলে পাপভাগী হইবেন কিনা?" পত্রলেখককে কি ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছিল তা জানা যায় না, তবে সমাজ-মানসের পরিচয় পাওয়া যায়।

ইংরেজরা এদেশে আসবার পর চুরুটের প্রচলন ক্রমশ দেশীয় লোকদের মধ্যেও বাড়তে লাগল। চুরুট খাওয়া কি শাস্ত্রসম্মত? গুড়-মাখানো মিষ্টি তামাকের চাহিদাও কলকাতার বাবুদের মধ্যে দ্রুত বেড়ে চলেছে। পণ্ডিতদের কাছে প্রশ্ন পাঠানো হল: এই দুটির মধ্যে কোন্‌টি দূষণীয়, কোন্‌টি নয়?

অধিকাংশ পণ্ডিত জানালেন: দুটিই দূষণীয়। তবু আশ্চর্য, ধূমপায়ীদের নতুন বিলাস চুরুট পেয়েছে অধিকতর সমর্থন। দিল্লীর হরিশ্চন্দ্র পণ্ডিত জানালেন: "চুরুট অল্পদিন হইতে প্রসিদ্ধ এবং যন্ত্র-নির্গত ধূমপান অপেক্ষায় চুরুটের ধূমপানে ন্যূন দোষ।"

তামাকের সঙ্গে গুড় মেশায় কোন্ জাতের লোক কে জানে! সুতরাং স্পর্শ-দোষের আশঙ্কা। তেমনি চুরুটের বেলাতেও আশঙ্কার কারণ আছে। চুরুট তৈরির সময় তামাকের পাতাগুলি যদি লেই (ময়দার আঠা) দিয়ে লাগানো হয় তাহলে আবার সেই স্পর্শদোষের ভয়। সুতরাং এ-সমস্যার সমাধানকল্পে যে বিধান দাঁড়াল তা হল: "গাছের রস থেকে তৈরি আঠা দিয়ে যদি তামাক-পাতা লাগানো হয় তাহলে চুরুট খেতে কোনো বাধা নেই।"

চাকিতে গম ভাঙার কথাই এতদিন সবাই জানত। যখন গম পেষাইয়ের কল প্রথম এল তখন সংশয় দেখা দিল, কলে তৈরি আটা বা ময়দা খাওয়া ধর্মসম্মত কিনা! দ্বিধার কারণ ছিল এই যে, "জলে ভেজা গম মুসলমান দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে হিন্দুরা উহা ব্যবহার করিতে পারে না।" কিন্তু কলে কিভাবে আটা তৈরি করা হয় তা স্বচক্ষে দেখলে সন্দেহ থাকবে না। সেটা ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দের কথা। উত্তর কলকাতায় গঙ্গার ঘাটে একটি কল বসেছে। "কলের সম্মুখে বাবু মতিলাল শীল মহাশয় গঙ্গার উপর একটি সুন্দর ঘাট ও চত্বর নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ঐ ঘাটের উভয় পার্শ্বে বসিবার স্থান আছে ও তুলসীমঞ্চাদির নিকট সন্ন্যাসীগণ শালগ্রাম পূজা করিয়া থাকে। আমাদের বিশ্বাস, হিন্দুরা অবসরমত ঘাট, শালগ্রাম ও তুলসী-মঞ্চাদি দেখিয়া যেমন প্রীত হইবেন, তেমনি কলটি দেখিয়াও ময়দা ব্যবহার করিবার কোন আপত্তি থাকিবে না।"

জীবনধারায় পাশ্চাত্য প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে কিছু নতুন ধরনের বাসনকোসন বাঙালীর গৃহে প্রবেশ করে। পূর্বে এজাতীয় পাত্রের ব্যবহার ছিল না। কাচের গেলাস, চীনামাটির বাসন, কলাই-করা বাসন ইত্যাদি ব্যবহার করা শাস্ত্রসম্মত কিনা

তা নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছিল। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা উত্তর দিয়েছিলেন।

কাচের গেলাসে জল ও দুধ পান করা যায় কিনা, এই ছিল প্রশ্ন। অধিকাংশ পণ্ডিতই বলেছেন : কাচের গেলাসে জল ও দুধ খাওয়া যায়। "যদি যবন কর্তৃক ফুৎকার এবং জল-সংযোগাদি দ্বারা নির্মিত না হয়" তাহলে কাচের গেলাস ব্যবহার করা যায়—বলেছেন কাশীধামের পণ্ডিত লল্লী মিশ্র। কিন্তু পুরীর ছয়জন পণ্ডিত, খাগড়ার ঠাকুরদাস বিদ্যারত্ন এবং আরও তিনজন এবং দিনাজপুরের মহারানী শ্যামমোহিনী দেবীর সভাপণ্ডিতরা কাচের গেলাসের ব্যবহার অনুমোদন করেননি। কাঁচের গেলাস পানপাত্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু কাচের পাত্রে ভোজন করা নিষিদ্ধ করেছেন বর্ধমানের তর্কসিদ্ধান্ত এবং নড়াইলের শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন।

কিন্তু স্ফটিকনির্মিত গেলাস সম্বন্ধে সকল পণ্ডিতই একমত। স্ফটিকের গেলাস ব্যবহারে কোনো বাধা নেই। ধুয়ে পরিষ্কার করে বারবার ব্যবহার করা চলে।

চীনামাটির বাসনে জল, দুধ বা চা পান করা যায় কিনা—এই ছিল সমস্যা। পণ্ডিতদের উত্তর থেকে মনে হয়, তাঁদের অনেকের ধারণা ছিল, চীনামাটির বাসন চীনেই তৈরি এবং সেখান থেকে আমদানী করা হয়। মাটির পাত্রের মত এদের ব্যবহার করবার জন্য অধিকাংশ পণ্ডিতই উপদেশ দিয়েছেন। সৈদাবাদের রামগোপাল তর্কালঙ্কার এবং অন্য পণ্ডিতরা বলেছেন যে, চীনামাটির বাসনে জল ইত্যাদি পান করা যায়, কিন্তু অপরকে দান করা যায় না। বৃন্দাবনের পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ ত্রিপাঠী এবং অন্যান্য স্থানের পণ্ডিতরা চীনামাটির বাসনকে ব্যবহারের অযোগ্য বলে বিধান দিয়েছেন। বর্ধমানের মহারাজা সিদ্ধান্ত করলেন : "চীনের বাসন যে বস্তু দ্বারা রঞ্জিত, যদি সেই বস্তু অস্পর্শনীয় না হয় এবং তাহা কখনও ব্যবহার হয় নাই ইহা নিশ্চয় জানা যায়" তাহলে ব্যবহারেব কোনো বাধা নেই।

কলাই-করা বাসন ব্যবহার সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উঠেছিল, তার উত্তরে কিছু বিভ্রান্তি দেখা যায়। পণ্ডিতেরা সকলেই এর ব্যবহার অনুচিত বলেছেন এই কারণে যে, বাসনগুলি তামার তৈরি। তখন তামার বাসনের উপরে কলাই হত কিনা জানি না। কিন্তু তামা তো এমনিতে অপবিত্র ছিল না। পুজার বাসন তো তামারই প্রশস্ত। বর্ধমানের মহারাজা এই সম্বন্ধে মন্তব্য করে বলেছেন : "নিষাদল এবং রঙ্গ এই বস্তু দ্বারা কলাই করা হয় এবং উক্ত কলাই-কার্য যবন জাতি দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু রঙ্গ অপবিত্র নহে ; যদি নিষাদল অপবিত্র না হয় এবং হিন্দু জাতি দ্বারা কলাই-কার্য সমাধা হয় তবে উক্ত কলাই-করা পাত্রে অন্নাদি

পাক করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি আহার করিতে পারেন…। তবে কলাই-করা বাসন যবন ম্লেচ্ছাদি জাতিতে ব্যবহার্য হয় বলিয়া আমাদের হিন্দু জাতিতে সর্বত্র ব্যবহার নাই।"

অফিসযাত্রী বাঙালীবাবুদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছিল। অনেক সময় অফিসের পোশাক পরেই খেতে হত। প্রধান খাদ্য না হলেও, দুপুরের টিফিন তো বটেই। পোশাক খুলে খাঁটি হিন্দু সেজে অফিসের মধ্যে টিফিন খাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু এইভাবে খেয়ে ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করা হচ্ছে না তো?

আবেদন পৌঁছল পণ্ডিতদের কাছে: রেশমী অথবা পশমী বস্ত্রের পোশাক কিংবা টুপি পরে খাওয়া বিধেয় কিনা। উত্তর এল: পারা যায় না। সকলেই এক কথা বলেছেন। উত্তরে একটু বিস্ময়ের কারণ আছে। পশমের আসনে বসে রেশমের কাপড় পরে পূজা করা তো প্রশস্ত বিধি। অবশ্য এর একটা কারণ হল—রেশমের ধুতিতে এবং চাদরে সেলাই নেই, কিন্তু জামায় সেলাই আছে। সেলাই জিনিসটা আধুনিক, সুতরাং পণ্ডিতমশায়দের অনুমোদন পায়নি। সেলাই করলেই অপবিত্র হয়ে যায়—এমন ধারণা ছিল তাঁদের।

ঠিক এই কারণে কম্বলাদি আসনে বসে খাওয়াকে পণ্ডিতরা অশুচি বলেননি। কারণ ঐ আসনে তো সেলাই নেই।

রাজপুর নিবাসী হরগোবিন্দ চক্রবর্তী কলকাতায় ব্যাগসা কোম্পানীতে কাজ করতেন। তাঁকে কোটপ্যান্ট পরে আপিসে টিফিন করতে হয়েছে, কাচের গেলাসে জল খেতে হয়েছে। পরিণাম কি মারাত্মক হতে পারে তা তখন বুঝতে পারেননি। ঐসব অপকর্মের জন্য তাঁর গ্রামের লোক তাঁকে একঘরে করল। হরগোবিন্দ পণ্ডিতদের বিচারসভায় এসে ব্যাকুল প্রার্থনা জানালেন এর একটা বিহিত করে দেবার জন্যে। কারণ, সামাজিক শাস্তির জন্যে তিনি বয়স্থ মেয়েদের বিয়ে দিতে পারছেন না।

সর্বদা জুতো পরে চলাফেরা করা অনেকেরই অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু হিন্দু সন্তানকে ধর্মসম্বন্ধীয় সকল কাজ করবার আগে জুতো খুলে রাখতে হত। দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করতে হলে অথবা প্রসাদ গ্রহণ করবার সময় জুতো খুলে রাখা ছিল বাধ্যতামূলক। এ নিয়মটা সকলেই মেনে চলত। কিন্তু জগন্নাথদেবের প্রসাদ গ্রহণের সময়ও কি তা মানতে হবে? তাঁর প্রসাদের ক্ষেত্রে আচারের কোনো বন্ধন নেই, জাতিভেদের প্রশ্ন নেই, স্পর্শদোষের ভয় নেই। এমনকি জগন্নাথদেবের প্রসাদের বেলায় বিধবারাও সকল বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত। সুতরাং জুতো পায়ে

প্রসাদ খেলে অন্যায় হবে কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ পণ্ডিতই অভিমত দিলেন, জুতো পায়ে জগন্নাথদেবের প্রসাদ খাওয়া যেতে পারে। সৈদাবাদের হরিশ্চন্দ্র ন্যায়রত্ন, গোলোকনাথ শিরোমণি ও কালীচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার বিধান দিলেন: "জগন্নাথদেবের প্রসাদ প্রাপ্তিমাত্রেই খাইবে।" অর্থাৎ জুতো পায়ে আছে কিনা, পরনে কি পোশাক আছে ইত্যাদি বিচার করতে গিয়ে বিলম্ব করা চলবে না।

উনবিংশ শতকের শেষার্ধে মাছ খাওয়া বিধিসম্মত কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন জেগেছিল। সম্ভবত বাঙালী উচ্চবর্ণের হিন্দু, বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন উঠেছিল। অধিকাংশ পণ্ডিতই বিধান দিয়েছেন যে, বিন্ধ্যপর্বতের পূর্বাঞ্চলে মাছ খাওয়া যেতে পারে, এ-বিষয়ে মনুরও অনুমোদন আছে। কেউ বলেছেন: "দেবতাকে নিবেদন করে মাছ খাওয়া যায়।" আবার কেউ বলেছেন: দেবপাত্রনিবেদিত মৎস্য ভোজন করিবে না।" কলিতে সর্ব দেশে মৎস্য ভোজন নিষিদ্ধ—এই মতও অনেকে দিয়েছেন। কেউ কেউ বিধান দিয়েছেন: "বিন্ধ্য পর্বতের পূর্বদিকে 'বৈধ' মৎস্য ভোজন করা যেতে পারে।" বৈধ মাছ হল রাজীব, সিংহতুণ্ড, সশল্ক, পাঠীন ও রোহিত। আঁশ নেই এমন মাছ এখন কোনো কোনো বাঙালী পরিবারে অচল। যেমন—পাবদা, কাজলী প্রভৃতি।

কলকাতায় যখন প্রথম ট্রামগাড়ির লাইন পাতা শুরু হয়, তখন কাগজে জল্পনা আরম্ভ হল—উচ্চবর্ণের হিন্দুদের জন্য বসবার পৃথক ব্যবস্থা হবে কিনা। এ নিয়ে কোনো বিচার হয়েছিল বলে দেখিনি।

সমুদ্র অতিক্রম করে বিদেশে গেলে হিন্দুর জাতিনাশ হয় কিনা এই প্রশ্ন উঠেছিল বর্ধমানের মহারাজার বিচারসভায়। অধিকাংশ পণ্ডিতের পাঁতি স্বীকার করে সিদ্ধান্ত হল: সমুদ্রযাত্রা করলে জাতিভ্রষ্ট হতে হবে। এর বছর কুড়ি পরে ঠিক এই বিষয়ের উপর আরেকবার বিচারের ব্যবস্থা করেছিলেন বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর। মহারাজা কমলকৃষ্ণের বাড়িতে ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের ১৯ অগাস্ট বিচারসভা বসল। এই একটি সভার উপর বিনয়কৃষ্ণ নির্ভর করেননি। বাংলাদেশের সকল অঞ্চলের পণ্ডিতদের মতামত সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। বাংলার বাইরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেও মতামত সংগ্রহের অভিযান চলেছিল। রানাড়ে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও তাঁদের মতামত জানিয়েছিলেন। তাছাড়া য়ুরোপীয়ান নাগরিকদেরও অনুরোধ জানানো হয়েছিল তাঁদের মন্তব্য জানাতে। সংবাদপত্রের মতামত তো ছিলই। একটি সামাজিক সমস্যা বিচারের জন্য দেশব্যাপী এমন আয়োজন পূর্বে আর হয়নি।

প্রশ্ন ছিল দুটি :

১) শাস্ত্রের নির্দেশ সম্পূর্ণ লঙ্ঘন না করে কেউ যদি জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করে তাহলে কি সে পতিত হবে ?

২) ইংলণ্ডে বা বিদেশের অন্য কোথাও কেউ যদি কিছুকাল এমন জীবন যাপন করে যাতে চরিত্রের স্খলন হয়নি, তবু কি তাকে পতিত বলে গণ্য করা হবে ?

বিভিন্ন সূত্র থেকে যেসব উত্তর পাওয়া গেল তা বিচার-বিবেচনা করে এই ব্যবস্থা দেওয়া হল :

১) সমুদ্রযাত্রাকালীন কেউ যদি জাহাজে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কোনো আচরণ না করে তাহলে পাতিত্য-দোষ স্পর্শ করবে না।

২) একমাত্র কিছুকালের জন্য বিদেশে বাস করাটাই পাতিত্যের কারণ হতে পারে না। যদি বিদেশেও শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী জীবনযাপন করা হয় তাহলে পতিত হবার প্রশ্ন নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র এক চিঠিতে বলেছিলেন : শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সমাজ-সংস্কার করবার তিনি বিরোধী। সময়োপযোগী পরিবর্তন করতেই হবে। জজ যদি ভিন্ন জাতের হয় তবে তিনি কি ব্রাহ্মণ বাদী বা প্রতিবাদী কোর্টে এলে উঠে দাঁড়াবেন ? প্রাচীন শাস্ত্রে কোনো আচারের সমর্থন থাকলেই তা মেনে চলা যায় না। কারণ জীবন সময়ের সঙ্গে বদলে যায়, প্রাচীন যুগের পরিবেশে সে তো স্থির হয়ে নেই। সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে বঙ্কিমের অভিমত এই চিঠিতে সুন্দর পরিস্ফুট হয়েছে।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনও সমুদ্রযাত্রা-সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। পণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতী এ-বিষয়ে তাঁর ব্যাখ্যা জানিয়েছিলেন তাঁদের। হিন্দু তীর্থযাত্রীরা পূর্বে পুরী যেত সমুদ্রপথে। সমুদ্রগমন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নয়। সমুদ্র পার হলে কারো জাত যায় না। উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করলে অবশ্যই পতিত হতে হবে। শুধু সমুদ্রযাত্রায় যে দোষ, তাকে বলা হয় 'পকীর্ণ' বা সামান্য লঙ্ঘন।

বাস্তব অবস্থার চাপে পড়ে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা যে উদার হয়, উপরের ব্যবস্থাপত্র তার প্রমাণ।

পণ্ডিতদের নিয়ে যে বিচারসভা, সেখানে শুধু সামাজিক সমস্যা নিয়েই আলোচনা হত না। বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া হত। বর্ধমানের মহারাজার উদ্যোগে অনেক দার্শনিক প্রশ্নের বিচার হয়েছে। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল :

প্রশ্ন : পরমেশ্বর স্তুতি বা নিন্দাতে তুষ্ট বা রুষ্ট হন কিনা ?

উত্তর : নির্গুণ নিরাকার পরমেশ্বর কিছুতেই তুষ্ট বা রুষ্ট হন না।

প্রশ্ন : ঈশ্বরের স্তব করলে কি ফল হয় ?

উত্তর : কোনো ফল হয় না।

প্রশ্ন : ঝড়, বন্যা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত কিনা ?

উত্তর : ঈশ্বর অশরীরী, অতএব অভিপ্রেত হতে পারে না।

এসব উত্তর থেকে মীমাংসাকর্তার মুক্তবুদ্ধি ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

অবশ্য এমন প্রশ্নও উত্থাপিত হয়েছে যা প্রধানত ন্যায়ের কূটতর্ক। প্রশ্ন হল : "উচ্চারণবশত অক্ষরের সৃষ্টি, না, অক্ষরবশত উচ্চারণের সৃষ্টি ?" এর উত্তর এই : "অগ্রে উচ্চারণ, পশ্চাৎ স্মরণার্থে অক্ষর সৃষ্টি হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আমরা সঙ্কীর্ণচিত্ত ও ধর্মান্ধ হিসাবে দেখতেই অভ্যস্ত, কিন্তু তাঁদের কারো কারো উত্তর বেশ চমকপ্রদ।

দেশীয় রাজা ও জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় নানা সামাজিক সমস্যার বিচার সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েছি। কিন্তু ইংরেজ সরকারও সমস্যা সমাধানের জন্য পণ্ডিতদের বিচারসভা আহ্বান করেছিলেন—তার দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। কলকাতা মেডিকেল কলেজের দেশীয় বিভাগের শিক্ষক মধুসূদন গুপ্ত ভারতে সর্বপ্রথম শব-ব্যবচ্ছেদ করেন ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। তখন হিন্দুদের নিকট মৃতদেহ (যার জাতের ঠিক নেই) স্পর্শ করা এবং তার ব্যবচ্ছেদ করা ছিল একান্ত-গর্হিত কাজ। সামাজিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে এবং আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রসারের জন্য মধুসূদন সাহসের সঙ্গে এগিয়ে এসেছিলেন। সমাজ তাঁকে ক্ষমা করেনি ; তিনি জাতিচ্যুত হন। যদিও মধুসূদন শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করে দেখিয়েছিলেন যে শব-ব্যবচ্ছেদ অপরাধ নয়, তবুও হিন্দু সমাজ তা মানেনি। প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্রে শল্যচিকিৎসায় নানাবিধ হাতিয়ারের উল্লেখ আছে। এ থেকে বোঝা যায়—দেহের বিভিন্ন অংশের অস্থি, পেশী ও স্নায়ু ইত্যাদির সঠিক অবস্থান সম্বন্ধে সেকালের চিকিৎসকেরা অভিজ্ঞ ছিলেন। এই অভিজ্ঞতা শব-ব্যবচ্ছেদ ব্যতীত সম্ভব নয়।

মধুসূদন নিজে সাহসী হলেও কেবল একজনের সাহায্যে চিকিৎসাবিদ্যার প্রসার ঘটানো সম্ভব নয়। জাতিচ্যুত হবার আশঙ্কা থাকলে কোনো হিন্দু ছাত্র এ-ব্যাপারে এগিয়ে আসবে না—এটা নিশ্চিত। তাই সরকার স্থির করলেন যে, পণ্ডিতদের বিচারসভা আহ্বান করে এই ব্যাপারের একটা মীমাংসা অত্যাবশ্যক। তদানীন্তন বাংলা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজের

কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বিচারসভা বসল। মধুসূদন গুপ্ত তাঁর নিজের যুক্তি পেশ করলেন এবং সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীও পাঁতি দিলেন যে, শব-ব্যবচ্ছেদ অশাস্ত্রীয় নয়। তখন থেকেই আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা প্রসারের পথ উন্মুক্ত হয়ে গেল।

বিধান দিয়ে বিপদে পড়ার নমুনাও দুর্লভ নয়। এমন একটি ঘটনার কথা এবার বলছি।

ত্রিবেণীর বিখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হলেও ধনী ছিলেন। এক লক্ষ টাকা নগদে এবং প্রচুর জমিজমা রেখে তিনি মারা গিয়েছিলেন। একদিন সকালে ডাকাত-সর্দার শ্যামলাল মল্লিক তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করে পায়ের কাছে দক্ষিণা রেখে জানতে চাইল: "লুঠের দ্রব্যে ডাকাতের স্বত্ব আছে কিনা?"

জগন্নাথ তাঁর 'বিবাদভঙ্গার্ণব' গ্রন্থে বিষ্ণুধর্মোত্তর থেকে শ্লোক উদ্ধার করে আগেই বলেছেন, স্বত্ব আছে। এই মীমাংসাই শুনিয়ে দিলেন শ্যামলালকে। সেই রাত্রিতেই তাঁর বাড়িতে ডাকাতি হল।

পূর্বে আমরা জলের কল এবং ময়দার কল স্থাপনের প্রতিক্রিয়ার কথা বলেছি। কিন্তু আর-একটি যুগান্তকারী যন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়নি। সেটি হল মুদ্রাযন্ত্র। ঊনবিংশ শতকের একেবারে গোড়া থেকেই মুদ্রাযন্ত্রের সঙ্গে বাঙালীর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। এর বিরুদ্ধে তেমন কোনো প্রতিবাদ দেখা যায় না। আমরা কেবল শুনতে পাই, যে-কোনো বর্ণের লোক দিয়ে ধর্মগ্রন্থ মুদ্রিত হলে নাকি তার পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হত—এরকম ধারণা কারো কারো ছিল। তাই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি গঙ্গাজলে কালি গুলে এবং ব্রাহ্মণ কম্পোজিটর দিয়ে অক্ষর সাজিয়ে ধর্মগ্রন্থ মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

মুদ্রাযন্ত্রের বিরুদ্ধে ১৮১৭-১৮ সালে একদল পণ্ডিত সরকারের নিকট আবেদন করেছিলেন যে, ছাপাখানা প্রচলনের পরে দেশ অশ্লীল পুথিপত্রে ছেয়ে যাচ্ছে। সুতরাং মুদ্রাযন্ত্র বন্ধ করে দেওয়া হোক। আবেদনকারীদের অভিযোগের যথেষ্ট সত্যতা ছিল, তাই কিছুকাল পরে ১৮৫৬ সালে সরকার অশ্লীল ছবি ও পুস্তক মুদ্রণ নিবারণের উদ্দেশ্যে একটি আইন প্রণয়ন করেন।

ঊনবিংশ শতক নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে। কিন্তু পণ্ডিতদের পাতি এবং বিচারসভার সিদ্ধান্ত অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করে দেখা হয়নি। অথচ এদের মধ্যে সেদিনকার বাঙালী হিন্দুর চিন্তাভাবনা এবং বিদেশী সভ্যতার সঙ্ঘাত কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

পাঠপঞ্জী

১ বর্ধমানের রাজসভায় পণ্ডিতদের বিচারের বিস্তারিত মুদ্রিত বিবরণ (দুই খণ্ড)।

২ সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে শোভাবাজারের রাজবাটিতে বিচারের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সমাজ-সংস্কার বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি চিঠি মুদ্রিত হয়েছে।

৩ উনবিংশ শতকে প্রকাশিত হিন্দুধর্ম-বিষয়ক বিভিন্ন পত্রিকা।

উনিশ শতকে সমাজ-সংস্কার

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে বাংলার সমাজ ছিল বদ্ধ জলাশয়ের মত। পাঁচশ বছরের মুসলমান রাজত্বে বাঙালী হিন্দু সমাজ আত্মরক্ষার ভ্রান্ত তাগিদে চারপাশে প্রাচীর তুলে দিয়েছিল, যেমন কোনো কোনো প্রাণী বিপদের ইঙ্গিত পেলে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে গোপন করে রাখে খোলসের অন্তরালে। ব্যতিক্রম ঘটেছিল শুধু একবার। চৈতন্যদেবের সময়। মুসলমান সভ্যতার সঙ্ঘাতে জাতিভেদ প্রথার ভিত্তি একটু টলে উঠেছিল। তারপর আবার সব স্থির, গতিহীন। শুধু বাংলার নয়, ভারতের সর্বত্রই হিন্দু সমাজের ছিল একই অবস্থা। পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগের অভাব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার নতুন নতুন আবিষ্কার সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার অভাব জনসাধারণের মানসিকতা সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল। মনের উদারতা যেখানে নেই সেখানে সহজেই কুসংস্কার আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ পায়। উনিশ শতকের প্রথমেও টোলের তদানীন্তন শিক্ষা ছন্দ-ব্যাকরণ-স্মৃতির চর্চায় ছিল আচ্ছন্ন। প্রাচীন ভারতের গৌরবময় যুগের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিয়ে দেবার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। বাংলা গদ্য তখনো সমৃদ্ধিলাভ করেনি, বই ছিল না বিভিন্ন বিষয়ের উপর। জনসাধারণ বইয়ের সাহায্যে তাদের চিন্তাধারাকে গতিশীল ও প্রাণবন্ত করবে—এমন সুযোগ ছিল না।

মুসলমান সমাজে তখন পর্যন্ত প্রাণচাঞ্চল্যের বেশ কিছু অবশিষ্ট ছিল। কিছুদিন পূর্বেও রাজার জাতি ছিল মুসলমান। সেই ভূমিকা পালন করবার জন্য মুসলমান সমাজকে খানিকটা ক্রিয়াশীল থাকতেই হত। এর ফলে সামাজিক কুপ্রথার ফাঁস তখনো আঁট হয়ে লাগেনি।

কিন্তু প্রায় পাঁচশ বছরের পরাধীন হিন্দু সমাজের অবস্থা ছিল অন্যরকম। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় হিন্দু সমাজ অসংখ্য কুপ্রথা ও কুসংস্কারে ওষ্ঠাগত-প্রাণ। সমাজের অপেক্ষাকৃত দুর্বল অংশীদার নারীর উপর হত নৃশংস অত্যাচার। সতী, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবার কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন, স্ত্রীশিক্ষায় বাধা ইত্যাদি নারীদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। এছাড়া ছিল শিশুহত্যা, দাসপ্রথা, চড়কপূজায় আত্মপীড়নের নানাবিধ নিষ্ঠুর রীতি, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে গঙ্গাযাত্রা ও অন্তর্জলি, এবং কঠোর ছুঁৎমার্গ, প্রভৃতি। তাছাড়া, বেদ-উপনিষদের কথা ভুলে

যাওয়ায় ধর্মের স্থান নিয়েছে আচার-অনুষ্ঠান এবং মিথ্যা জাঁকজমক। তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার নানা ব্যভিচার ও বৈষ্ণবদের আখড়ায় রাধাকৃষ্ণের লীলার অনুকরণে বোষ্টম-বোষ্টমীদের স্থূল প্রেমের লীলাখেলা সমাজে এক কদর্য পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল।

কুপ্রথা, কুসংস্কার এবং নৈতিক অধঃপতন যে অবস্থার সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে ব্যক্তির বিকাশ সম্ভব নয়। সুতরাং সমাজের মঙ্গল এবং দেশের উন্নতিও সুদূরপরাহত। এই সত্য উপলব্ধি করে দুঃখের সঙ্গে রামমোহন ডিগবিকে লিখেছিলেন: **"Hindus in general are more superstitious and miserable, both in performance of their religious rites, and in their domestic concerns, than the rest of the known nations of the earth."**

রামমোহনের পরে বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ এবং আরও অনেকে সমাজের দুর্দশার কথা বারবার বলেছেন এবং কুসংস্কার ও কুপ্রথা দূর করবার জন্য তৎপর হয়েছেন। সমাজকে কলুষমুক্ত করবার তৎপরতাই ঊনবিংশ শতকের বৈশিষ্ট্য। পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দীতে সমাজের অবস্থায় কোনো বেদনাবোধের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমাজ-সংস্কারের প্রচেষ্টা প্রাধান্য লাভ করেছে দেখা যায়। এই সমাজসচেতনতা জাগ্রত হয়েছিল কয়েকটি কারণে। প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রত্যক্ষভাবে সমাজ-সংস্কারে প্রথমে উদ্যোগী হননি। কারণ কোম্পানীর নীতি ছিল এদেশের অধিবাসীদের সমাজ এবং ধর্মজীবনে কোনোরকমে হস্তক্ষেপ না করা। কোম্পানী মূলত ব্যবসায়ী, দেশ সুষ্ঠুভাবে শাসন করে প্রজার মঙ্গল করবার উদ্দেশ্য নিয়ে তারা ভারতে আসেনি। কোম্পানীর ডিরেক্টররা সাবধান হয়েছিলেন আরও একটি কারণে। তাঁরা ভারতে পোর্তুগীজ রাজত্বের ক্রমাবলুপ্তির দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন—পোর্তুগীজরা নিজেদের সামাজিক রীতিনীতি এবং সভ্যতা ভারতীয়দের উপর চাপিয়ে দিতে তৎপর হয়েছিল বলেই তাদের সাম্রাজ্য সঙ্কুচিত হয়ে ক্রমশ প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকেছিল। সুতরাং বাংলাদেশে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম সত্তর বছরে সামাজিক কুপ্রথা নিবারণের জন্য কোনো নিষেধাত্মক কঠোর বিধি প্রণয়ন করা হয়নি। অথচ আধুনিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ প্রগতিশীল ইংরেজ জাতির কাছ থেকে শুভ সমাজবোধ আশা করা স্বাভাবিক ছিল।

কিন্তু পরোক্ষভাবে ইংরেজ রাজত্ব আমাদের সমাজ সম্বন্ধে সচেতন করেছে। প্রকৃতপক্ষে, ইংরেজের সংস্পর্শে না এলে এ-বিষয়ে আমরা কবে যে সচেতন হতাম তার নিশ্চয়তা ছিল না। আমরা সচেতন হয়েছি নানাভাবে। কয়েকটি প্রধান কারণ এই :

১) ইংরেজী শিক্ষা এক সম্পূর্ণ নতুন জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করে দিয়েছিল। আমাদের চিরাগত সংস্কার-পীড়িত মনে পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে চিন্তাবিপ্লবের সৃষ্টি হল। এতদিন যে-জীবনকে দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করে চলেছি, সেই জীবন সম্বন্ধে, ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগল, ইচ্ছা হল সবকিছু পাশ্চাত্যের নতুন আলোতে বিচার করে দেখি।

২) শিক্ষিত ইংরেজ কর্মচারীরা ভারত এবং তার ধর্ম ও সংস্কৃতি জানবার জন্য উৎসুক হয়ে সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করে হিন্দুর প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ নতুন করে আবিষ্কার ও প্রচার করলেন। তাঁদের গবেষণালব্ধ ফল থেকে জানতে পারলাম প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার গৌরবময় ইতিহাস। প্রকৃত হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতা থেকে আমরা যে অনেক দূরে সরে এসেছি তা উপলব্ধি করতে অসুবিধা হল না। শিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তিরা দেখলেন সমাজে ধর্মের নামে কত কুপ্রথা ও কুসংস্কার চলছে। প্রাচীন ভারতকে জানবার সুযোগ পাওয়ায় সমকালীন সমাজের কুপ্রথাগুলি সহজেই চোখে পড়েছে এবং তা দূর করবার জন্য অনেকেই সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন।

৩) কোম্পানীর কাজকর্ম চালাবার তাগিদে কলকাতা এবং অপর কতকগুলি শহরাঞ্চলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠল। এই শ্রেণীর লোকরা কমবেশি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, আপিসে কাজ করবার জন্য এদের জীবনযাত্রার রীতিনীতি হল একটু নতুন ধরনের। এই প্রথম যোগ্যতা স্বীকৃতি পেল। ব্রাহ্মণ হলেই চাকরিতে পদোন্নতি হবে না ; যোগ্যতা যার থাকবে—যে জাতিই হোক না কেন—তারই হবে উন্নতি। এক ঘরে এক টেবিলে বসে কাজ করতে হবে। ছুঁৎমার্গের কথা ভাবলে চাকরি করা চলবে না। জাতি-বৈষম্যের মূলে পড়ল কঠোর আঘাত। মধ্যবিত্ত চাকরিজীবীদের পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, ইংরেজী শিক্ষা এবং নতুন জীবনদর্শন সমাজে আনল নতুন আবহাওয়া। পুরনো, জীর্ণ সমাজকে ভেঙে এক সজীব সমাজের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হল মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

৪) সমাজের অচলায়তনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডতম আঘাত এসেছিল খ্রীস্টান পাদরীদের কাছ থেকে। নিজেদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার জন্য হিন্দু ধর্মের

দোষত্রুটি বড় করে দেখানো তাঁদের কর্তব্যের প্রায় অঙ্গ হিসাবেই দেখা হত। সমাজের কু-রীতিগুলি সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করতে এইসব বিরূপ সমালোচনা বিশেষরূপে সাহায্য করেছে। তাছাড়া খ্রীস্টান মিশনারীরা সমাজের স্থায়ী রূপান্তরে সহায়তা করেছেন শিক্ষা বিস্তারের সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। স্কুল-কলেজ খুলেই তাঁরা কর্তব্য শেষ করেননি। শিক্ষার সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করবার জন্য বাংলা টাইপ ও পুস্তক মুদ্রণের কৌশল আবিষ্কার, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ইত্যাদি নানাবিধ কাজ করেছেন তাঁরা। বাংলা ও ইংরেজী পত্রপত্রিকার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা সহজ ভাষায় জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থাও তাঁরা করেছেন।

ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মুষ্টিমেয় বাঙালীর চেয়ে মিশনারীদের প্রভাব কম ছিল না। কারণ এঁরা সমাজের নিচু স্তরের মধ্যে কাজ করেছেন, বুঝিয়েছেন তাদেরই মাতৃভাষায়। বিদ্যালয়, ছাপাখানা, বই ও সংবাদপত্রের স্থায়ী প্রভাব পড়েছে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের উপর। এই প্রভাব সর্বত্র খ্রীস্টধর্মের আকর্ষণের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়নি। মিশনারীদের প্রচেষ্টা আমাদের জীবনকে সংস্কারবদ্ধ গণ্ডি থেকে মুক্তির পথ-নির্দেশ করেছে। খ্রীস্টধর্ম প্রচারকেরা সবসময় যে শুধু ধর্মীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই কাজ করেছেন তা নয়। উইলিয়াম কেরী চাষের উন্নতির জন্য কত গবেষণা করেছেন; সতীদাহ বন্ধ করবার জন্য কত পাদরী সরকারের কাছে বারবার আবেদন করেছেন; নীলচাষীদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর ফলে লঙ সাহেবের কারাবরণ তাঁর বিচিত্র কর্মধারার একটিমাত্র উদাহরণ।

সতীদাহ নিষিদ্ধ করা ব্রিটিশ আমলের উল্লেখযোগ্য প্রথম সমাজ-সংস্কার। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ব্রিটিশ পাদরী এবং কোম্পানীর কোনো কোনো কর্মচারী এই নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করবার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছিলেন। ব্রিটেনেও এই নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। জনসাধারণের মন প্রস্তুত ছিল, সতীদাহ নিষিদ্ধ হবার পরে যে একটি লিখিত আবেদন ছাড়া কোনো বিক্ষোভ হয়নি—এটাই তার প্রমাণ। কিন্তু কোম্পানীর সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। প্রথমে জজ পণ্ডিতদের অভিমত নেওয়া হল যে সতীদাহ শাস্ত্রসম্মত কিনা! শাস্ত্রে যেসব বিশেষ ক্ষেত্রে নারীর সতী হওয়া নিষিদ্ধ, সরকার শুধু সেইসব নারী যাতে সতী হতে না পারে তার ব্যবস্থা করে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের মত রামমোহনও দেখিয়েছিলেন সতীদাহ শাস্ত্রানুমোদিত নয়। লর্ড বেন্টিঙ্ক প্রধানত ব্যক্তিগত উদ্যোগে সতীদাহ নিষিদ্ধ করে ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে একটি আইন প্রণয়ন করেন। রামমোহন সতীদাহ বন্ধ করবার

সমর্থক হলেও আইন করাটা পছন্দ করেননি। তাঁর অভিমত ছিল যে, "the practice (of Sati) might be suppressed, quietly and unobservedly by increasing the difficulties and by indirect agency of the police"

এর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সমাজ-সংস্কারমূলক ব্যবস্থা—বিধবার পুনর্বিবাহ বৈধকরণ। বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই অনুমোদনমূলক আইনটি ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে বিধিবদ্ধ হয় অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর। সতীদাহ নিবারণের মত নিষেধাত্মক আইন নিয়ে কোনো আন্দোলন হয়নি, কিন্তু অনুমোদনমূলক বিধবার পুনর্বিবাহ আইন নিয়ে হিন্দু সমাজে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল।

এর অল্পদিন পরেই আরম্ভ হল সাতান্ন বিপ্লব। হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেবার ফলেই সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছে, ব্রিটিশ শাসকদের মনে নানা কারণে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। বিধবার পুনর্বিবাহ অনুমোদন করে আইন-প্রণয়ন বিপ্লবের যে অন্যতম প্রধান কারণ—সে-বিষয়ে কারো মনে সন্দেহ রইল না।

সুতরাং বিপ্লবের পরে মহারানী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে প্রথমেই ভারতবাসীকে আশ্বাস দিলেন যে, তাদের ধর্মবিশ্বাসে কোনোক্রমেই আঘাত দেওয়া হবে না। নতুন বিপ্লবের আশঙ্কায় ব্রিটিশ সরকার এই শর্তটি বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে পালন করেছেন। তার ফলে উনবিংশ শতকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক যা-কিছু উল্লেখযোগ্য সংস্কারে সরকারের সাহায্য পাওয়া গেছে—তা হয়েছে সাতান্ন বিপ্লবের পূর্বে। এরপরে সরকার সমাজ ও ধর্ম-সম্পর্কিত বিষয়ে সহজে হস্তক্ষেপ করতে চাননি। বিদ্যাসাগর সহজেই বিধবা-বিবাহ অনুমোদক আইন পাশ করাতে পেরেছিলেন ; কিন্তু সাতান্ন সালের পরে বহু-বিবাহ নিরোধক আইন অনেক চেষ্টা করেও পাশ করাতে পারেননি, যদিও তাঁর প্রস্তাবের পক্ষে বহু লোকের সমর্থন ছিল এবং জে. পি. গ্র্যাণ্ট তাঁকে আশ্বাসও দিয়েছিলেন। সরকার তাঁকে এবং অন্যান্য আবেদনকারীকে জানালেন যে, "legislation on the subject would only be mischievous if it were not in accordance with the feelings and practice of a large majority of the people."

সাতান্ন বিপ্লবের পরে যে-দুটি উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা সরকারকে জনমতের চাপে গ্রহণ করতে হয়েছিল, তা হল 'বিশেষ ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি, ১৮৭২' এবং সহবাস সম্মতির বয়স-সংক্রান্ত আইন। একটি অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা বধূর শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আলোড়ন সৃষ্টি না হলে শেষোক্ত ব্যবস্থাটি আদৌ গ্রহণ করা

হত কিনা সন্দেহ। কত অসংখ্য কুসংস্কার ও কুপ্রথার বন্ধনে জাতির অগ্রগতির পথ রুদ্ধ ছিল। ইংরেজ সরকার সেইসব বাধা দূর করে আমাদের এগিয়ে যাবার পথ উন্মুক্ত করে দেননি। সুতরাং তাঁরা সভ্য সরকারের দায়িত্ব পালন করেননি।

উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার-প্রচেষ্টায় নারী প্রাধান্য লাভ করেছে—একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষিত, সংস্কারপ্রয়াসী বাঙালীর দৃষ্টি স্বভাবতই প্রথমে পড়ত গৃহকোণে আবদ্ধ ও নির্যাতিত নারীদের উপর। সতীদাহ নিবারণ, বিধবা-বিবাহ অনুমোদন, বাল্য-বিবাহ ও বহু-বিবাহ বন্ধ করা, স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন, অবরোধ প্রথার উচ্ছেদ প্রভৃতি উদ্যোগ সংস্কার-প্রচেষ্টার এক বৃহৎ অংশ অধিকার করে আছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ এবং আরও অনেকে নারীকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য কাজ করেছেন এবং দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। নারীর সমর্থনে শতাব্দীব্যাপী প্রচেষ্টার ফলে স্বাধীনতার পরে ভারতে নারীরা পুরুষের সমান অধিকার জীবনের সকল ক্ষেত্রে সহজেই পেয়েছে; যে-অধিকার ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় অনেক সংগ্রামের পর পাওয়া গেছে।

নারীমুক্তির এই আন্দোলন প্রত্যেক পরিবারকেই স্পর্শ করেছিল। ছুঁৎমার্গ-বিরোধী আন্দোলন সমাজের সকল স্তরেই প্রভাব বিস্তার করেছে। এই আন্দোলন অবশ্য এসেছে অনেক পরে। ইয়ং বেঙ্গল দলের যুবকরা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে জাতবিচার অগ্রাহ্য করত। কলকাতাকে কেন্দ্র করে নগর-সভ্যতা গড়ে ওঠায় প্রয়োজনের তাগিদে জাতিভেদের কঠোরতা কিছুটা শিথিল হয়েছিল। রেলগাড়ি, ষ্টিমার, স্কুল-কলেজ, সভা, থিয়েটার ইত্যাদি বিভিন্ন জাতির লোকদের একত্র মিলিত হবার সুযোগ করে দিয়েছে; জাতিভেদের গোঁড়ামি এর ফলেও খানিকটা হ্রাস পেয়েছে। কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম সমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রবর্তন করেন। বিবেকানন্দ সকল শ্রেণীর হিন্দুকে ভাই বলে বুকে টেনে নিয়েছেন। কিন্তু জাতিভেদের কলঙ্ক দূর হয়নি। এর জন্য দেখা যায়, কলকাতায় যখন ট্রাম চলতে শুরু করে তখন প্রশ্ন উঠেছিল—উচ্চবর্ণের হিন্দুদের জন্য পৃথক আসন সংরক্ষিত থাকবে কিনা!

দাস-ব্যবসায় ইংলণ্ডে নিষিদ্ধ হবার অল্পদিন পরে এদেশেও বন্ধ হয়ে যায়। এর জন্য কোনো আন্দোলন দরকার হয়নি। আন্দোলন দরকার হয়নি চড়কপূজার নিষ্ঠুরতা, অন্তর্জলি, গঙ্গাযাত্রা প্রভৃতি কুপ্রথা বন্ধ করবার জন্যও। প্রশাসনিক উদ্যোগেই ধীরে ধীরে এগুলি লোপ পেয়ে গিয়েছিল। বহু কুপ্রথা এখনো আমাদের সমাজে রয়ে গেছে।

কলকাতার নতুন নাগরিক জীবনের দুটি অভিশাপ সুরাপান ও বেশ্যাসক্তি

সমাজসেবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সুরাপান-নিবারণী সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। নাটক, উপন্যাস ও পত্রিকার প্রবন্ধে এই দুটি কু-অভ্যাসের নিন্দাবাদ করা হত।

বড় বড় কুপ্রথা, যা বহুদিন যাবৎ চলে আসছিল, তা বন্ধ করবার জন্য রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মত সংস্কারকেরা এগিয়ে এসেছিলেন; সরকারও তাঁদের কাজে সহায়তা করেছেন। কিন্তু বাঙালী হিন্দুর জীবনে অসংখ্য সংস্কারমূলক নতুন প্রশ্ন জেগেছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে। ইংরেজরা এদেশে আসবার পূর্বে এই সমস্যাগুলি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেনি। এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দ্বারস্থ হতে হত। রাজা এবং জমিদাররা জনসাধারণের সুবিধার জন্য পণ্ডিতদের সভা আহ্বান করে প্রশ্ন ও সিদ্ধান্ত ছাপিয়ে বিতরণের ব্যবস্থা করতেন। অবশ্য এসব সিদ্ধান্ত প্রায়ই কুসংস্কার দূর করবার অনুকূল হত না।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বিদেশী খ্রীস্টান পাদরীরা হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতা এবং অন্যান্য ত্রুটিগুলির উপর প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করেছিলেন। চারপাশে সেদিন ধর্মের নামে যা চলত তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অনেকে খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষা নিতে লাগল। সেদিন রামমোহনের আবির্ভাব না ঘটলে হিন্দু সমাজ বহু প্রতিভাধর শিক্ষিত বাঙালী তরুণকে হারাত।

রামমোহন মিশনারীদের পদ্ধতি অবলম্বন করে বই, পুস্তিকা এবং পত্রিকা প্রকাশ করে প্রমাণ করলেন যে, আসল হিন্দু ধর্মে পৌত্তলিকতা নেই, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাই হিন্দুর সাধনা—যে-সাধনা শিক্ষিত যুক্তিবাদী হিন্দু শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে শাস্ত্রগ্রন্থের কিছু কিছু অংশ তিনি অনুবাদ করেছিলেন। রামমোহন ধর্মকে যথাসম্ভব যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হয়েছিলেন। তাঁর প্রভাবে খ্রীস্ট ধর্ম থেকে তরুণদের দৃষ্টি ফিরেছিল হিন্দু ধর্মের প্রকৃত রূপটির দিকে।

ধর্মের ক্ষেত্রে যে যুক্তিবাদ এনেছিলেন রামমোহন, সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রেও তাঁর ছিল সেই যুক্তির উপর নির্ভরতা। সমাজে নারী হল পুরুষের সমান অংশীদার, সুতরাং সে কেন পুরুষের কাছ থেকে অন্যায় অত্যাচার সইবে? এই যুক্তিকে কেন্দ্র করেই রামমোহন নারীকে সর্ববিধ বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। অন্য সব-কিছু সমাজ-সংস্কারেই রামমোহনের প্রেরণা ছিল মূলত যুক্তিবাদ।

বিদ্যাসাগরের কথা পৃথকভাবে আলোচনার দাবি রাখে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কারকদের মধ্যে একমাত্র তিনিই শুধু বই লিখে, পুস্তিকা প্রচার করে এবং বক্তৃতা দিয়ে নিবৃত্ত থাকেননি। তিনি শুধু তাত্ত্বিক সংস্কারক ছিলেন না। সমাজ থেকে সকল কুসংস্কার দূর করবার জন্য নিজের সময়, শক্তি এবং অর্থ নিয়োজিত করেছিলেন। বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করেই তাঁর সন্তুষ্টি ছিল না, এই বিধিকে সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বহু ক্লেশ স্বীকার করেছেন এবং প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থসাহায্য করেছেন। অনেকে তাঁকে ঠকিয়ে টাকা নিয়ে গেছে, এবং ঋণের বোঝা নিয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁকে বিব্রত হতে হয়েছে।

মানবপ্রীতিই তাঁকে সামাজিক অত্যাচার ও অবিচার দূর করবার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ করেছে। কোনো পুঁথিগত তাত্ত্বিক সামাজিক আদর্শের দ্বারা তিনি উদ্বুদ্ধ হননি। বিদ্যাসাগর বিধবা নারীর বেদনা অন্তরে অনুভব করেছেন, তাদের দুঃখ দূর করবার সঙ্কল্প এসেছে পরে। অত্যাচারিতের প্রতি গভীর মমতাই তাঁর সংস্কার-প্রচেষ্টার প্রেরণা। বিধবাদের দুঃখের প্রতি উদাসীন কঠিন-হৃদয় দেশবাসীকে ধিক্কার দিয়ে তিনি বলেছেন: "অভ্যাস দোষে, তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত রহিয়াছে যে, হতভাগ্য বিধবা-দিগের দুরবস্থা দর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্য রসের সঞ্চার হওয়া কঠিন, এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত।...তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়!"

বিদ্যাসাগরের জীবনের সর্বপ্রধান কীর্তি বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করা। সতীপ্রথা-নিবারক-আইন পাশ হবার প্রায় ছাব্বিশ বছর পরে এই আইনটি সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। বিধবা-বিবাহ প্রচলন করবার প্রস্তাবটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য়; যদিও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের পরিবারে বিধবা-বিবাহে কখনও উৎসাহ দেননি। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবটি প্রকাশিত হবার পর হিন্দু সমাজে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সতীদাহ-নিবারক-আইনের পর এরূপ আলোড়ন হয়নি। এর কারণটা অবশ্য অনুমান করা যেতে পারে। সব বিধবা সতী হত না। বৈধব্য জীবনের আচরণ সম্বন্ধে দীর্ঘকাল যাবৎ

সমাজের সামনে একটা আদর্শ ছিল। বিধবার পুনর্বিবাহ সেই আদর্শের ঘোরতর পরিপন্থী। সতী না হয়েও নিষ্ঠাবতী বিধবার আদর্শ পালন করলে সমাজকে প্রচণ্ড আঘাত করা হয় না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই ছিলেন বিধবা-বিবাহ-আইন প্রণয়নের মুখ্য উদ্যোক্তা। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে এই বিল নিয়ে আলোচনার সময় জে. পি. গ্র্যান্ট বলেন: "......Pundit Eshwar Chunder Vidyasagur, the learned and eminent Principal of the Sanskrit college, who was the chief mover in the agitation out of which the bill had arisen, and was one of the subscribers to the Petition which had been presented to the Council a few weeks ago praying for the measure, called upon him (grant) and consulted him on the propriety of asking the council for such a law as the bill now brought in."

১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর গ্র্যান্ট কাউন্সিলে বিলটির সমর্থনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে এই কথা বলেন। এমন একটি বিল প্রস্তাব করবার জন্য বিদ্যাসাগরের প্রশংসাও তিনি করেন। ঐদিনই জেমস্ কোলভিল কাউন্সিলে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা উল্লেখ করে বলেন: "The particular measure before the Council was prompted by one who, in reputation for learning, yielded to no Pundit in this city, or in this part of India, but who, not suffering his antiquarian lore to contract his mind, as it is too apt to do, by fixing it too constantly on the past, was conspicuous amongst the more liberal of his countrymen for enlarged views, and a desire for social progress."

বিধবার পুনর্বিবাহ আইনসিদ্ধ করা সংস্কারক বিদ্যাসাগরের সর্বপ্রধান কীর্তি। কিন্তু তাঁর সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টা এর মধ্যেই শেষ হয়ে যায়নি। তিনি তৎকালীন সমাজের বহু কুসংস্কার দূর করবার জন্য সংগ্রাম করেছেন। বক্তৃতা দিয়ে বা বই লিখেই তিনি কর্তব্য শেষ করেননি। সমাজ-সংস্কারের উদ্যমকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে এবং তাকে দৈনন্দিন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বিদ্যাসাগর উদ্যোগী হয়েছিলেন। এ-বিষয়ে যাঁরা উৎসাহী, তাঁদের জন্য তিনি একটি প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করেছিলেন। প্রতিজ্ঞাপত্রটি এরূপ: "আমি ধর্ম সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি ১) কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা করাইব; ২) একাদশ বর্ষ পূর্ণ

না হইলে কন্যার বিবাহ দিব না ; ৩) কুলীন, বংশজ, শ্রোত্রিয় অথবা মৌলিক ইত্যাদি গণনা না করিয়া স্বজাতীয় সৎপাত্রে কন্যাদান করিব ; ৪) কন্যা বিধবা হইলে এবং তাহার সম্মতি থাকিলে, পুনরায় তাহার বিবাহ দিব ; ৫) অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে পুত্রের বিবাহ দিব না ; ৬) এক স্ত্রী থাকিতে আর বিবাহ করিব না ; ৭) যাহার এক স্ত্রী বিদ্যমান আছে, তাহাকে কন্যাদান করিব না ; ৮) যেরূপ আচরণ করিলে প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, তাহা করিব না ; ৯) মাসে মাসে স্ব স্ব মাসিক আয়ের পঞ্চাশতম অংশ নিয়োজিত ধনাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিব, ১০) এই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া কোনো কারণে উপরি-নির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞাপালনে পরাঙ্মুখ হইব না।"

এই কঠোর প্রতিজ্ঞাপত্রে ১২৫ জনের বেশি লোক স্বাক্ষর দেয়নি। কিন্তু এ থেকে বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হবে। দু-একটি কুপ্রথা দূর করবার মধ্যেই তাঁর সংস্কার-প্রচেষ্টা নিবদ্ধ ছিল না। সামাজিক সংস্কারের ব্যাপক আদর্শ ছিল তাঁর সামনে। আর এই প্রতিজ্ঞাপত্রে নারীর দুঃখ নিবারণের উদ্দেশ্য প্রাধান্য লাভ করেছে।

বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ করবার পর বহু-বিবাহ বন্ধ করবার জন্য কাজ শুরু করেন। অবশ্য বহু-বিবাহ নিষিদ্ধ করা সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙালীর মনে অনেকদিন যাবৎ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। ১৮৩৬ সালের ২৩ এপ্রিল সংখ্যার 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় সাতাশজন ব্রাহ্মণের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল যাঁরা অনেকেই পঞ্চাশ-ষাটটি বিবাহ করেছিলেন। এই সংবাদটি ছিল নিন্দাসূচক। এর কিছু পরেই বহু-বিবাহ বন্ধ করবার আবেদন করে ভারত সরকারের নিকট বিদ্যাসাগর পত্র প্রেরণ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের সমর্থনে কয়েক হাজার লোকের স্বাক্ষরযুক্ত আরও একশ সাতাশটি আবেদন সরকারের নিকট প্রেরিত হয়। এদিকে বহু-বিবাহ সমর্থনকারী গোঁড়া হিন্দুদলও নীরব ছিল না। তারা শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছিল বহু-বিবাহ ধর্মানুসারী রীতি। বিদ্যাসাগর নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রের নিষেধাত্মক বচন উদ্ধৃত করে 'বহু-বিবাহ' নামে একটি পুস্তক প্রচার করেন এবং দেশের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে বহু-বিবাহের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে আনেন। এ-কাজে তাঁর সহায়ক ছিলেন পূর্ববঙ্গের রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। তিনি নিজেও বহু-বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু শেষ জীবনে এর বিষময় ফল সম্পর্কে সচেতন হয়ে বহু-বিবাহের সমালোচনামূলক বহু গান এবং পুস্তক রচনা করেন। বহু-বিবাহ এবং কৌলীন্য প্রথা ছিল অঙ্গাঙ্গিরূপে যুক্ত। এর

ফলে সমাজে কলুষের সৃষ্টি হয়েছিল। তা ধর্ম ও চরিত্রকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছিল। বিদ্যাসাগর বর্ধমানের মহারাজার সঙ্গে বাংলাদেশের আইন সভায় বহু-বিবাহ নিবারণের জন্য আবেদন পেশ করেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সিপাহী বিদ্রোহের পর সরকার হিন্দু ধর্ম ও সংস্কার নিষেধ করবার জন্য কোনো আইন পাশ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাই বহু-বিবাহের আবেদন অনেকদিন যাবৎ ফাইলে আবদ্ধ ছিল। তাছাড়া রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে একদল হিন্দু বহু-বিবাহ সমর্থনের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করায় কর্তৃপক্ষ এ-বিষয়ে উদ্যোগী হননি।

তথাপি বিদ্যাসাগরের বারবার তাগিদের ফলে শেষ পর্যন্ত বিষয়টি বিবেচনা করবার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয় ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে। এই কমিটিতে বিদ্যাসাগর ছাড়া আরও কয়েকজন বাঙালী সভ্য ছিলেন। বিদ্যাসাগর ব্যতীত অন্য বাঙালী সদস্যরা বহু-বিবাহ নিবারণের জন্য আইন করার বিরোধিতা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রও বিরোধী। সুতরাং সরকার বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এই বিষয়ে সরকার পক্ষের অভিমত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিদ্যাসাগর যে কাজ করতে পারেননি, প্রায় একশত বৎসর পরে স্বাধীন ভারত সেই কাজ হিন্দু কোড-এ বিধিবদ্ধ করেছে।

সাতান্ন বিপ্লবের পর ব্রিটিশ সরকার যে দুটি উল্লেখযোগ্য বিধি আইনানুগ করেছে তারা হল 'বিশেষ বিবাহ আইন, ১৮৭২'। এই বিধান ব্রাহ্ম সমাজের চাহিদাপূরণের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। বিদ্যাসাগর ভেবেছিলেন এই আইনটির দ্বারা প্রস্তাবিত বহু-বিবাহ নিবারক আইনের উদ্দেশ্য অনেকটাই সফল হতে পারে। কিন্তু তখন তাঁর দেহ রোগে ক্লিষ্ট, নিজে উদ্যোগী হয়ে কিছু করবার সামর্থ্য ছিল না। তবে তিনি তাঁর পরিচিত অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এ-বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

উল্লেখযোগ্য বিধির অপরটি হল 'সহবাস সম্মতি আইন'। বেহরাম মালাবারি এই আইনটি বিধিবদ্ধ করবার জন্য বড়লাট লর্ড ডাফরিনের নিকট আবেদন করেছিলেন। ডাফরিন আবেদন প্রত্যাখ্যান করে 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' কারণ প্রকাশ করেছিলেন। মূল কথা: সেই ব্রিটিশ সরকারের নীতি, অর্থাৎ হিন্দুদের ধর্ম ও সামাজিক প্রথা পরিবর্তন করবার জন্য আইন করা হবে না। তিনি আশা করেছেন যে, শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যদি যুগের অনুপযোগী কোনো প্রথা প্রচলিত থাকে—তার পরিবর্তন এমনিতেই ঘটবে।

একটি অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা বধূর উপর কামোন্মত্ত প্রাপ্তবয়স্ক স্বামীর অত্যাচারে

বধূটির শোচনীয় মৃত্যুর ফলে যে আন্দোলন আরম্ভ হয় তাকে সরকার উপেক্ষা করতে পারেনি। যদিও সমাজের এক বৃহৎ অংশে প্রবল আপত্তি ছিল, তথাপি আইনটি পাশ হয়ে যায়। বয়স নির্ধারণের জন্য সরকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত আহ্বান করেছিলেন। উত্তরে বিদ্যাসাগর ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১ তারিখে তাঁর নিজের মত জানিয়ে বলেছেন : "...I would propose that it should be an offence for a man to consummate marriage before his wife has had her first menses. As the majority of girls do not exhibit that symptom before they are thirteen, fourteen or fifteen, the measure I suggest would give larger, more real, and more extensive protection than the Bill. At the same time, such a measure could not be objected to on the ground of interfering with a religious observance."

আমাদের সমাজে গৌরীদানের প্রথা ছিল। কিন্তু বালিকা বধূ ঋতুমতী না হওয়া পর্যন্ত শ্বশুরবাড়ি যাবার নিয়ম ছিল না। এজন্যই বিদ্যাসাগর বলেছেন যে, ঋতুমতী বধূর সঙ্গে সহবাসের আইন বিধিবদ্ধ করলে হিন্দুর সামাজিক প্রথার উপর আঘাত করা হবে না। মালাবারি সহবাস সম্মতির ন্যূনতম বয়স স্থির করতে চেয়েছিলেন বারো। বিদ্যাসাগরের অভিমত তার চেয়ে অনেক বেশি বিজ্ঞান-সম্মত, অথচ অনেক বাঙালী ডাক্তার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এরূপ বয়স নির্দিষ্ট করার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দু-বিবাহ' নিবন্ধে ডাঃ কার্পেণ্টারের অভিমত উল্লেখ করে বলেছেন : "তবে আমাদের দেশে ১০/১১ বৎসর বয়সেও যে অনেক স্ত্রীলোকের যৌবনসঞ্চার হইবার উপক্রম দেখা যায় তাহা বাল্য-বিবাহের অস্বাভাবিক ফল বলিতে হইবে। বাল্যকালে স্বামী সহবাস অথবা বিবাহিত রমণী, প্রগল্‌ভা দাসী ও পরিহাসকুশলা বৃদ্ধাদের সংসর্গে বালিকারা যথাসময়ের পূর্বেই যৌবনদশায় উপনীত হয়—ইহা সহজেই মনে করা যায়। যৌবনলক্ষণ প্রকাশ হইবামাত্রই যে স্ত্রী-পুরুষ সন্তানোৎপাদনের যোগ্য হয়, তাহাও নহে।"

বিদ্যাসাগর যদিও বহু-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুসংস্কার দূর করবার জন্য তৎপর হয়েছিলেন, তথাপি একথা তিনি ভাল করেই জানতেন, সকল কুসংস্কারের জন্মস্থান অশিক্ষার অন্ধকারে। তাই তিনি উপরোক্ত দুই-একটি বিশেষ আন্দোলনে যোগ দেবার পূর্বেই স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের কাজ আরম্ভ করেছিলেন।

১৮৫০ সাল থেকে বিদ্যাসাগর বেথুন স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হন। পরে তাঁকে এই স্কুলের অবৈতনিক সম্পাদক করা হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর শুধু কলকাতায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের কাজ করে সন্তুষ্ট ছিলেন না। যেখানে অশিক্ষার অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে স্বাভাবিক চিন্তাভাবনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সেই দূর গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন এবং বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বিদ্যালয়ের জন্য ছাত্রী সংগ্রহ করেছেন। তিনি হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়ায় পঁয়ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন ১৮৫৭ থেকে মে, ১৮৫৮-র মধ্যে। এইসব বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১৩০০। বিদ্যালয়গুলির জন্য মাসিক ব্যয় ছিল ৮৪৫ টাকা। বিদ্যাসাগর ছোটলাট হ্যালিডে সাহেবের মৌখিক অনুমতি নিয়ে বিদ্যালয়গুলি স্থাপন করেছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দারা গ্রহণ করেছিল বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্মাণের ব্যয়। শুধু শিক্ষকদের বেতন সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যাবে—এই ছিল বিদ্যাসাগরের আশা। তেমন মৌখিক আশ্বাসও মিলেছিল। কিন্তু পরে ভারত সরকার টাকা দিতে অস্বীকার করায় বিদ্যাসাগর বিপদে পড়েছিলেন। বাংলা সরকার শিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কথা জানিয়ে ভারত সরকারকে অনুরোধ জানাবার ফলে শিক্ষকদের বকেয়া বেতন দিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু এরপরে লণ্ডন থেকে যখন টাকা না দেবার সিদ্ধান্ত জানানো হল তখন বিদ্যাসাগর নিরুপায় হয়ে পড়লেন। যে করেই হোক বিদ্যালয়গুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে—এই ছিল তাঁর সঙ্কল্প। অর্থসংগ্রহের জন্য তিনি স্থাপন করলেন 'নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার'। পরিচিত ধনী এবং মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীর লোকের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ করে বিদ্যালয়গুলি বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করলেন বিদ্যাসাগর। এইজন্য তিনি নিজেও অনেক টাকা দিয়েছেন। অনেক ইংরেজ রাজকর্মচারীও এই কাজে সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছিলেন।

১৮৬৬ সালের শেষভাগে শ্রীমতী মেরী কার্পেণ্টার কলকাতায় আসেন এবং শিক্ষা-বিস্তারে অগ্রণী বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচিত হতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের আকাঙ্ক্ষা উভয়ের মধ্যেই প্রবল ছিল। তাই তাঁরা দুজনে একসঙ্গে বহু স্কুলের কাজকর্ম দেখেন।

শ্রীমতী কার্পেণ্টারের বিশেষ আগ্রহ ছিল এদেশে শিক্ষয়িত্রী গড়ে তোলার জন্য। কারণ তিনি দেখেছিলেন যে, কলকাতার নিকটবর্তী বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে পুরুষ শিক্ষকরাই শিক্ষাদান করেন। কিন্তু শিক্ষয়িত্রী ছাড়া বালিকাদের প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়—এই ছিল তাঁর প্রকৃত বিশ্বাস। একদিন শ্রীমতী

কার্পেন্টার ও বিদ্যাসাগর উত্তরপাড়ায় নর্মাল স্কুল পরিদর্শনে যান। ফেরার সময় বিদ্যাসাগরের ঘোড়ার গাড়ি উলটে যাওয়ায় তিনি যকৃতে প্রচণ্ড আঘাত পান। এই দুর্ঘটনার পর থেকেই বিদ্যাসাগরের স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। যে বহুমূত্র রোগ তাঁর মৃত্যুর অন্যতম কারণ, তার সূচনা এই আঘাত থেকেই হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা।

জাতিভেদের কুপ্রথা দূর করতেও বিদ্যাসাগর প্রয়াসী হয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হবার পর তিনি ব্রাহ্মণেতর জাতির ছাত্রদের কলেজে ভর্তি করবার জন্য সুপারিশ করে অনেক চিঠি লিখেছিলেন।

তাঁর আর-একটি কীর্তি 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যান্যুইটি ফাণ্ড' স্থাপন। এটি স্থাপিত হয় ১৮৭২ সালের ১৫ জুন তারিখে। গৃহকর্তার মৃত্যুর পরে হিন্দু পরিবারগুলি অর্থাভাবে অসহায় হয়ে পড়ে। তাদের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যেই এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছিল। যে ব্যক্তি মাসিক চাঁদা দেবে, তার মৃত্যুর পর তার পরিবার প্রতি মাসে সেই চাঁদার দ্বিগুণ অর্থ পাবে।

সমাজ-সংস্কার কার্য ছিল বিদ্যাসাগরের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তিনি শুধু অন্যের পরিবারে সংস্কারমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চাননি, নিজে এক বালিকা বিধবাকে বরণ করে নিয়েছিলেন পুত্রবধূ হিসাবে। সংস্কার প্রচলনের উৎসাহে বিভিন্ন স্থান ঘুরে কত শাস্ত্রান্ধ পণ্ডিতকে বোঝাতে গিয়ে অপমানিত হয়েছেন, কটূক্তি ও অপমানের শিকার হয়েছেন—তার ইয়ত্তা নেই। তিনি বিধবা পাত্রী এবং তার জন্য পাত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাড়ি বাড়ি ঘুরেছেন। বিধবার বিবাহ-সভায় সানন্দে অংশগ্রহণ করেছেন। অকৃপণ হস্তে দিয়েছেন আর্থিক সহায়তা। সুতরাং শুধু আইন পরিষদে বিধান পাশ করেই কর্তব্য শেষ করেননি। সমাজে সংস্কার যাতে প্রচলিত হয়, কার্যকর হয়—তার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁর ক্লান্তি ছিল না।

যেসব পণ্ডিত শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করে সংস্কারের পথে বাধার প্রাচীর তুলতে চেয়েছিলেন, সেই প্রাচীর ধূলিসাৎ করবার উদ্দেশ্যে তিনি সমর্থনমূলক শাস্ত্রবচন উদ্ধার করে দেখিয়েছেন যে তাঁর কাজে ধর্মশাস্ত্রেরই অনুমোদন রয়েছে। সেদিনকার ধর্মাশ্রিত সমাজে কোনরূপ সংস্কার-কার্যে উদ্যোগী হলে এই অনুমোদন দেখানো ছিল অত্যাবশ্যক।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন বিদ্যাসাগরের মনোভাবকে সম্যক উপলব্ধি করতে পারেননি। তিনি তাই 'বঙ্গদর্শনে' তাঁর সমালোচনা করে বলেছেন : "আমাদিগের

বিবেচনায় বহু-বিবাহ নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি প্রজার হিতার্থে আইনের আবশ্যকতা আছে ইহা স্থির হয়, তবে ধর্মশাস্ত্রের মুখ চাহিবার আবশ্যক নাই।"

বহু-বিবাহ বন্ধ করবার আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের উৎসাহ দেখে বঙ্কিম তাঁকে ডন কুইকসটের সঙ্গে তুলনা করতে দ্বিধা করেননি। আজকের দিনে বঙ্কিমের আক্রমণ অযৌক্তিক এবং অত্যন্ত কঠোর বলে মনে হয়।

কিন্তু এইসব নিন্দাবাদ বিদ্যাসাগরকে বিচলিত করতে পারেনি। তিনি বিধবা-বিবাহের সমর্থনে এবং বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে শাস্ত্রবচন উদ্ধার করে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার দ্বারা নিজের বক্তব্যকে এমন যুক্তিসহ রূপে উপস্থিত করেছেন যে, তা মুক্তবুদ্ধি শিক্ষিত সমাজের নিকট সহজেই গ্রহণীয় হয়েছিল। সমকালীন সামাজিক অবস্থায় শাস্ত্রবচন দ্বারা বক্তব্যকে সমর্থন করা বাস্তব বুদ্ধিরই পরিচায়ক।

বিদ্যাসাগরের সকল সংস্কার-প্রচেষ্টার মূল যে গভীর মানবপ্রীতি এবং নিপীড়িতদের প্রতি সহানুভূতি—তা সহজেই বোঝা যায়। বিধবা নারীর প্রতি যে তাঁর কি গভীর বেদনাবোধ ছিল তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধেও তাঁর বক্তব্য থেকে তেমনি একটি কোমল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। এ-সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: "যে পতির প্রণয়ের উপর প্রণয়িনীর সমুদায় সুখ নির্ভর করে, এবং যাহার সচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন সুখী ও অসচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন দুঃখী হইতে হইবেক, পরিণয়কালে তাদৃশ পরিণেতার আচার-ব্যবহার ও চরিত্র বিষয়ে যদ্যপি কন্যার কোন সম্মতির প্রয়োজন না হইল, তবে সেই দম্পতির সুখের আর কি সম্ভাবনা রহিল।"

আবার এখানে বিদ্যাসাগর কত আধুনিক: "মনের ঐক্যই প্রণয়ের মূল। সেই ঐক্য বয়স, অবস্থা, রূপ, গুণ, চরিত্র, বাহ্যভাব ও আন্তরিক ভাব ইত্যাদি নানা কারণের উপর নির্ভর করে। অস্মদ্দেশী বালদম্পতিরা পরস্পরের আশয় জানিতে পারিল না, অভিপ্রায়ে অবগাহন করিতে অবকাশ পাইল না, অবস্থার তত্ত্বানুসন্ধান পাইল না, আলাপ-পরিচয় দ্বারা ইতরেতরের চরিত্র-পরিচয়ের কথা দূরে থাকুক, একবার অন্যোন্য-নয়ন-সঙ্ঘটনও হইল না, কেবল একজন উদাসীন বাচাল ঘটকের প্রবৃত্তিজনক বৃথা বচনে প্রত্যয় করিয়া পিতামাতার যেরূপ অভিরুচি হয়, কন্যা-পুত্রের সেই বিধিই বিধি নিয়োগবৎ সুখদুঃখের অনুল্লঙ্ঘনীয় সীমা হইয়া রহিল।"

বিদ্যাসাগরের সমাজ-ভাবনা থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়—তিনি ছিলেন কালের পুরোগামী। তাই সমকালীন সমাজের পরিপূর্ণ এবং সহৃদয় সমর্থন তিনি পাননি।

বিদ্যাসাগরের পর কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ এবং আরও অনেকে

সমাজের কুপ্রথা দূর করবার জন্য তৎপর হয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র নানাবিধ সংস্কার-কার্য আরম্ভ করেন। রামমোহন থেকে দেবেন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনেকেই ব্রাহ্মসমাজভুক্ত এমন কিছু কিছু রীতি মেনে চলতেন যা গোঁড়া হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল। রামমোহন নিজে উপবীত ধারণ করতেন, ব্রাহ্মণ পাচকের রান্না খেতেন। তারপরে অনেকদিন যাবৎ আচার্যের উপবীত ধারণের রীতি বজায় ছিল। অসবর্ণ বিবাহেও সমাজে উৎসাহ ছিল না। কেশবচন্দ্র হিন্দু সমাজ-সুলভ এইসব রীতিনীতি বন্ধ করে প্রবর্তন করেছিলেন এক নতুন ধারা। বেদ-বেদান্তের ধর্মকে একমাত্র গ্রহণযোগ্য বলে তাঁর মনে হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে তিনি সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শে ক্রমশ বিশ্বাসী হয়ে পড়েন। ব্রাহ্ম সমাজে বিবাহের গণ্ডিকে প্রসারিত এবং সংশোধিত করবার উদ্দেশ্যে তাঁর উদ্যোগে 'বিশেষ বিবাহ বিধি' আইন পাশ হয়। বিদ্যাসাগরের ইচ্ছা ছিল এই আইন হিন্দু সমাজেও প্রযোজ্য হোক। কেশবচন্দ্র শিক্ষা ও অর্থ-নীতির ক্ষেত্রে আরও নানাবিধ সংস্কারের সূচনা করেছিলেন। নারীর শিক্ষা এবং অবরোধ প্রথা দূরীকরণের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি প্রথম অবরোধ ভেঙে দিয়ে নারীকে রাজপথে এনেছিলেন। একদিন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে দেখা করতে যাবার কথা। ঠিক করলেন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। যাবেন পালকিতে। সস্ত্রীক রাজপথে বের হবার কথা প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কলুটোলার বাড়ির সামনে জনতার ভিড় জমে উঠল; কিন্তু কেশবচন্দ্র ভ্রূক্ষেপ না করে জনতার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। নারীমুক্তির ইতিহাসে এটি ছিল স্মরণীয় দিন। দিনটি ১৩ এপ্রিল, ১৮৬২।

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ-সংস্কার ভাবনার মধ্যেও ছিল নারী ও অন্ত্যজের প্রতি দরদ। জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর ভারতবাসীকে তিনি বুকে টেনে নিয়েছিলেন। নারীকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন মর্যাদার আসনে। তাঁর তথা রামকৃষ্ণ মিশনে সেবার আদর্শে উচ্চ ও নীচ বর্ণের মধ্যে কোনো ভেদ ছিল না। কিন্তু বিবেকানন্দের সকল আদর্শ এবং কল্যাণের উদ্দেশ্য ছিল আধ্যাত্মিকতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ। তাই সমাজ-সংস্কারের বিতর্কমূলক কাজে তাঁর প্রত্যক্ষ আবির্ভাব তেমন বড় হয়ে ওঠেনি।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় সমাজের নানাবিধ কুসংস্কারের সমালোচনা আছে। প্রথম পর্বের রচনায় নারীর প্রতি যে গভীর সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় তা বর্তমান শতকে আত্মপ্রত্যয়শীল 'আপন ভাগ্য জয়'-এর বিশ্বাসে বলীয়ান নারীচরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কারের ইতিহাসে বাদ-প্রতিবাদ বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। বাদ-প্রতিবাদে যুক্তিসঙ্গত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ মীমাংসা অনেক ক্ষেত্রেই ঘটেনি। একদিকে ইয়ং বেঙ্গল সমাজ সকল প্রকার অর্থহীন সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মদ-গোমাংস ইত্যাদি দম্ভ সহকারে খাবার মধ্যে প্রগতির সন্ধান পেয়েছে; আবার প্রতিক্রিয়া হিসাবে একদল হাঁচি-টিকটিকির বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। রামমোহনের যুক্তিবাদ শতাব্দীর শেষভাগে ভক্তিবাদের কাছে পরাজিত হয়েছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় সতীদাহের মধ্যে নিষ্ঠুরতা দেখতে পাননি; দেখেছেন স্বামীর চিতায় স্বেচ্ছায় আত্মদানের মধ্যে সতীত্বের পরাকাষ্ঠা।

আরও অনেক কুপ্রথার প্রচলন সমাজে ছিল। বিদ্যাসাগর প্রমুখ সংস্কারকরা সুরাপান, বেশ্যাসক্তি, বাল্য-বিবাহ প্রভৃতি নিবারণের জন্য উদ্যোগী হয়েও সরকারী আনুকূল্যের অভাবে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেননি। একদিন সরকারের আগ্রহেই সতীদাহ নিবারক আইন হয়েছিল; বিধবা-বিবাহ প্রচলনের প্রস্তাবটি দ্রুত সরকারী সমর্থন লাভ করে। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিদ্যাসাগরের আবেদন গভর্নমেণ্টের নিকট পাঠানো হয়; ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে আইন পাশ হয়ে যায়।

সাতান্ন বিপ্লবের পর সংস্কার বিষয়ে সরকারী নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। এইজন্যই বহু-বিবাহ বন্ধে জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও সরকার হস্তক্ষেপ করা বাঞ্ছনীয় মনে করেননি।

'সমুদ্র-যাত্রা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, সমুদ্র-যাত্রা শাস্ত্রবচনে নিষিদ্ধ থাকলেও সমুদ্রের ওপার থেকে নব-সংস্কৃতির ঢেউ এসে আমাদের সমাজে প্রবেশ করবে। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আমাদের সামাজিক কুপ্রথার জগদ্দল পাথরটা বিশেষ টলাতে পেরেছে বলে মনে হয় না। কারণ বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ হবার পর থেকে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নতুন ভাবধারা আরও বিস্তার-লাভ করেছে, তথাপি সামাজিক কুপ্রথার প্রতি আমাদের বিরাগ লক্ষ্য করা যায় না। অপরদিকে সকল সংস্কার-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্রতর হয়েছে দেখা যায়।

সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে দুটি ভিন্ন মত প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। একদল বলতেন সংস্কারের পক্ষে শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করা নিরর্থক। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ছিলেন এই দলের প্রবক্তা। এই অভিমত বঙ্কিমের একটি চিঠিতে

পাওয়া যায় : "I do not believe that it is either possible or desirable to promote social reforms by invoking the authority of the sastras. I had to object on the same ground to the late lamented Iswar Chandra Vidyasagar's proposals to suppress polygamy with the aid of the sastras ;..."

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাও ছিল এইরকম। সমুদ্র-যাত্রা-বিতর্ক সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন : "সমুদ্র-যাত্রার উপকারিতার পক্ষে ভূরি ভূরি প্রমাণ থাক না কেন, যদি শাস্ত্রে তাহার বিরুদ্ধে একটিমাত্র বচন থাকে, তবে সমস্ত প্রমাণ ব্যর্থ হইবে। তাহার অর্থ এই, আমাদের কাছে সত্যের অপেক্ষা বচন বড়, মানবের শাস্ত্রের নিকট জগদীশ্বরের শাস্ত্র ব্যর্থ।"

সংস্কার-সাধনে আইনের সহায়তা তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। বালগঙ্গাধর তিলক বলতেন, আমাদের সামাজিক ব্যাপারে বিদেশী রাজশক্তির হস্তক্ষেপের কোনো অধিকার নেই। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের অভিমতও ছিল অনুরূপ। তাঁরা বলতেন, ধীরে ধীরে শিক্ষা একদিন শুভবুদ্ধির সূচনা করবে। সেদিন স্বাভাবিকরূপেই সকল সামাজিক অসঙ্গতি দূর হয়ে যাবে। সুতরাং সংস্কার জোর করে সমাজের উপরে চাপিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই।

সমকালীন সাময়িকপত্রেও সরকারের হস্তক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করা হয়েছে। 'সোমপ্রকাশে'র মত উদার মতাবলম্বী পত্রিকাও ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ১৬ কার্তিক সংখ্যায় সহবাস সম্মতি আইন প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন : "আমাদের রাজা বিদেশী, তাঁহাদের রুচি ভিন্ন, চিন্তাপ্রণালী ভিন্ন এবং ধর্মনীতি ও ধর্ম সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে যাওয়াও নিতান্ত অযুক্তি। রাজা যদি স্বদেশী হইতেন, সামাজিক ক্রিয়া-কাণ্ডের উপর তাঁহার কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি থাকিত না। হিন্দু রাজাই পূর্বাপর দেশাচারের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন, এখন ইংরাজের হস্তে সেই ক্ষমতাটুকু যাচিয়া দিতে গেলে আমাদের সর্বনাশ।"

সহবাস সম্মতি বিধিবদ্ধ হবার পর ১৮৯১ সালের ২০ মার্চ থেকে ৬ জুনের মধ্যে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তিনটি আপত্তিকর প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা অভিযুক্ত হয়। এই পত্রিকায় 'ইংরেজ হিন্দুধর্ম ধ্বংসের জন্য উদ্যোগী হয়েছে এব তার ভালমানুষের মুখোশ খুলে পড়েছে'—একথা বলা হয়। আদালতে মার্জনা ভিক্ষা করে তবেই পত্রিকাটি অব্যাহতি লাভ করে।

শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করবার বিরূপ সমালোচনা যথার্থ মনে হয় না। সেদিনকার

ধর্মাশ্রিত সমাজে কুপ্রথা ও কুসংস্কারকে দৃঢ়মূল করতে এক শ্রেণীর পণ্ডিত ও পুরোহিত শাস্ত্রের দোহাই দিত। এদের আধিপত্য সমাজে বিশেষরূপে অনুভূত হত। শাস্ত্রকে যেখানে সমর্থনের সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করবার রীতি, সেখানে যুক্তিসমৃদ্ধ অন্য শাস্ত্রবচন দ্বারাই তা খণ্ডন করা সহজসাধ্য। শুধু রামমোহন বা বিদ্যাসাগরই শাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করেননি, ঊনবিংশ শতাব্দীর ছোট-বড় সব পণ্ডিত, পুরোহিত এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিই প্রমাণ হিসাবে শাস্ত্রকে উপস্থিত করেছেন। এখনও যাঁদের চিন্তা-ভাবনা স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা লাভ করেছে তাঁদের বচন উদ্ধৃত করা একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। রামমোহন সমাজ-সংস্কার ছাড়া ব্রাহ্ম ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্যও বেদ-বেদান্তের ভাবনাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। নির্বাচিত শাস্ত্রবচন পুস্তকাকারে প্রচার করে আমাদের বুঝিয়েছিলেন, হিন্দু ধর্মের প্রকৃত রূপটি কী।

সামাজিক বন্ধন রক্ষা পায় দুটি উপায়ে। প্রথমত, নাগরিকের শুভবুদ্ধি ও নীতিবোধ প্রতিবেশীকে নিরুপদ্রবে বাস করতে সহায়তা করে; দ্বিতীয়ত, সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করলে শাস্তির ভীতি অন্যায় কার্যে বিরত রাখবার সহায়ক হয়। শাস্তি হয় আইনের বিধানে এবং এই আইন মানুষকে অন্যায়ের পথ থেকে নিবৃত্ত রাখে। নাহলে দেহের শক্তি যার বেশি, সে দুর্বলকে পীড়ন করে নিশ্চিহ্ন করে দিত।

আমাদের জীবন আইনের বন্ধনে বাঁধা আছে। শিক্ষা, অর্থোপার্জন, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, পারস্পরিক লেনদেন—সবই আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং শুধু কুপ্রথার সাহায্যে মানুষকে পীড়ন আইনের দ্বারা যদি বন্ধ করা হয়, তাতে আপত্তি করবার কী থাকতে পারে! যাঁরা বলেন শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করবার প্রয়োজন নেই, আইন অনাবশ্যক—তাঁরা আদর্শ জগতের কথা কল্পনা করেন। শিক্ষাবিস্তার হলেই সকল সামাজিক অন্যায় দূর হয়ে যাবে—একথাও যুক্তিসহ নয়। কারণ এখনও আমরা দেখি অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিও তুচ্ছ কারণে নিজের স্ত্রীকে হত্যা করে। শিক্ষা এক্ষেত্রে এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে এইসব অকারণ হিংসাবৃত্তি সমাজ থেকে দূর করতে সক্ষম হয়নি।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পূর্ব থেকে বাঙালীর জীবনে রাজনীতির সর্বব্যাপী প্রভাব শুরু হয়। তার ফলে, যেন ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষবশত 'আমাদের যা-কিছু সব ভাল'—এরকম একটা মনোভাব প্রথমে এসে গিয়েছিল। সেই কারণে সমাজ-সংস্কারের উদ্যম রাজনীতির পশ্চাতে স্থান পেয়েছে। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ

এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল কনফারেন্সের কলকাতা অধিবেশনে শ্রোতা পাওয়া ভার হয়ে উঠেছিল। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন কিছু শ্রোতা সংগ্রহ করে আনায় সেবার বাংলার মুখরক্ষা হয়েছিল।

বাংলা বইয়ের কথা

প্রস্তর, লৌহ, তাম্র প্রভৃতি যুগ পার হয়ে আমরা এখন পৌছেছি বইয়ের যুগে। বর্তমানকালে বই আমাদের জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। বই কেন জীবনে অপরিহার্য হবে? গুটেনবার্গ বিচল হরফ বা মুভেবল টাইপে বই ছাপার পূর্বেও শিক্ষা ও সংস্কৃতির তো অভাব ছিল না! তখন অত্যন্ত সীমিত-সংখ্যক পুথি ছিল, মালিকরা যা প্রায়ই যকের ধনের মত আগলে থাকতেন।

মুদ্রণ-পূর্ব যুগের সমাজে সকল প্রকার বিদ্যা অর্জন করতে হত গুরুর কাছে শাগরেদি করে। গুরু সন্তুষ্ট হলে শেখাতেন, নাহলে নয়। অনেক সময় গুরুকে সন্তুষ্ট করে বিদ্যালাভ করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। একলব্যকে তো নিজের আঙুল কেটে গুরুদক্ষিণা দিতে হয়েছিল। পুথির মালিক সেদিনের গুরুরা ছিলেন বিদ্যার পুঁজিপতি।

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে গণতন্ত্র এসে যেমন একনায়কতন্ত্রের ভিত শিথিল করে দিল, তেমনি বিদ্যার ক্ষেত্রে মুদ্রিত বই নিয়ে এল জ্ঞানার্জনের অবাধ সুযোগ। কয়েকজন গুরু জ্ঞানের পুঁজিপতি হয়ে থাকবেন—তেমন দিন আর রইল না। এখন গুরুবাদ নেই, গুরুর স্থান নিয়েছে বই। তাই পৃথিবীর সকল উন্নত দেশই পুস্তক প্রকাশনে এগিয়ে আছে দেখা যায়। যে-দেশের লোক প্রয়োজনীয় বই পায় না, তাদের উন্নতি ব্যাহত হয়। এর প্রমাণ এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে বইয়ের উৎপাদনের হার। পৃথিবীর মোট পুস্তক উৎপাদনের ৩০ শতাংশও এই দুই মহাদেশে ছাপা হয় কিনা সন্দেহ। অবশ্য জাপানের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হয়। জাপান অনেক পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা বেশি বই প্রকাশ করে। আর এটাই তার বৈষয়িক উন্নতির সূচক।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। পুথির যুগে, এমনকি মুদ্রণের প্রথম পর্বেও ধর্মেরই ছিল প্রাধান্য। মধ্যযুগে য়ুরোপের গির্জায় পুথির কাঠের মোটা আচ্ছাদনকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হত, যাতে কেউ মূল্যবান পুথিটি নিয়ে না যেতে পারে। কারণ বড় বড় পুথি সুন্দর করে নকল করা ছিল পরিশ্রমসাধ্য কাজ। এমনকি বাংলাতেও যখন ছাপার প্রবর্তন হল তখন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি গঙ্গাজলে কালি গুলে ব্রাহ্মণ কম্পোজিটর দিয়ে ধর্মগ্রন্থ ছাপানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। ক্রমে চিত্তবিনোদনের জন্য মুদ্রণের সহায়তা

নেওয়া আরম্ভ হল। কাব্য, নাটক, কাহিনী ইত্যাদি ছাপা হতে লাগল পাঠকের আনন্দের উপকরণ হিসাবে। শিল্প-বিপ্লবের পর হাতে-কলমে শিল্প-শিক্ষার কৌশল আয়ত্ত করবার প্রয়োজন দেখা দিল। তখন গুরুদের আধিপত্য দূর হয়েছে, শাগরেদি করে শেখার সুযোগ অল্প, সুতরাং জীবিকার প্রয়োজনে বইয়ের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগল। যে দেশ তার নাগরিকদের প্রয়োজনীয় বই সরবরাহ করতে পারে না, সেই দেশ বাঁচার প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে।

এবার বাংলা বইয়ের কথায় আসা যাক। ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে হলহেডের ইংরেজীতে লেখা বাংলা ব্যাকরণে দৃষ্টান্ত হিসাবে কিছু কিছু অংশ বাংলা হরফে ছাপা হয় হুগলীর অ্যানড্রুজ সাহেবের ছাপাখানায়। বাংলা বিচল বা মুভেবল হরফে ছাপার এটি প্রথম নমুনা। এই হরফগুলি নির্মাণ করেছিলেন কোম্পানীর কর্মচারী এবং প্রাচ্যবিদ্যায় অভিজ্ঞ বিশিষ্ট পণ্ডিত চার্লস উইলকিনস। উইলকিনস-এর পূর্বে উইলিয়াম বোলট্স বাংলায় বিচল হরফ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু কোম্পানীর সহায়তার অভাবে এবং আর্থিক অনটনের জন্য সম্পূর্ণ বর্ণমালা তৈরি করে উঠতে পারেননি। অবশ্য বেশ কিছুকাল পূর্বে য়ুরোপে মুদ্রিত কয়েকটি গ্রন্থে বাংলা বর্ণমালার নমুনা হিসাবে ব্লক মুদ্রণ দেখা যায়। পোর্তুগীজ পাদরীরা বিচল হরফ নির্মাণের সমস্যার মধ্যে না গিয়ে রোমান হরফে বাংলা ব্যাকরণ ও খ্রীস্টান ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন।

বিচল হরফ প্রবর্তনের ফলে বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী বিপ্লবের সূচনা হয়। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের বর্ণমালায় যে রূপভেদ ছিল, তা প্রায়ই পাঠের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটাতো। বিচল হরফ প্রবর্তনে শুধু যে বইপত্র দ্রুত প্রকাশিত হতে লাগল তাই নয়, বর্ণমালার একরূপতা পাঠকের পক্ষে দ্রুত পাঠ সহজসাধ্য করে দিল। এর ফলে পুথির সঙ্কীর্ণ জগৎ থেকে বাঙালীর পাঠচর্চা বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত করতে আর বাধা থাকল না।

উইলকিনসের পরিকল্পনা অনুযায়ী কোম্পানী কলকাতায় তার নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করে। এখান থেকে প্রশাসনিক প্রয়োজনে যেসব বইপত্রের দরকার, তা ছাপা হতে আরম্ভ হয়। যতদূর জানা যায়, প্রথমে ছাপা হয়েছিল কতকগুলি আইনের বই। এর মধ্যে বোধহয় প্রথম অনূদিত উল্লেখযোগ্য বই হল জোনাথান ডানকানের 'ইম্পে কোড'-এর বঙ্গানুবাদ (১৭৮৫)। বইটির মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৪৬ ; তার মধ্যে ১২০ পৃষ্ঠা বাংলায় ছাপা। ধারাবাহিক মুদ্রিত বাংলা গদ্যের এত বেশি নমুনা এর পূর্বে পাওয়া যায়নি। ডঃ বরুণকুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেন যে, ঐ

বছর বোধহয় কোম্পানীর প্রেসে ডানকানের আরও একটি ছোট বই মুদ্রিত হয়েছিল—সেটি পিটের 'ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট'-এর অনুবাদ। তাঁর মতে, এটি সম্পূর্ণ বাংলায় মুদ্রিত প্রথম বই। যদিও বইটির পৃষ্ঠাসংখ্যা মাত্র ১৭।

এরপর থেকে বাংলায় অনূদিত আইন গ্রন্থের প্রাধান্য দেখা যায়। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে রেগুলেশানস্-এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়, বইটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪০০। পর বৎসরই এর দ্বিতীয় সংস্করণ বর্ধিত আকারে প্রকাশিত হয়, দাম ২৬ টাকা। এরপর থেকে আরও কতকগুলো সংস্করণ হয় এবং অন্য অনুবাদকের আইন পুস্তকও পাওয়া যায়।

ঊনবিংশ শতকের সূচনায় উইলিয়াম কেরী শ্রীরামপুরে ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা করে বাংলা প্রকাশনার ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূত্রপাত করেন। শুধু খ্রীস্টান ধর্মগ্রন্থ এবং প্রচার-পুস্তিকা প্রকাশ করেই তিনি নিবৃত্ত থাকেননি, হিন্দু পাঠকদের জন্য রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদিও প্রকাশ করেছেন। এছাড়া তাঁর সবচেয়ে বড কীর্তি হল—সকল পাঠকের জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক লিখিয়ে এবং তা ছাপিয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হওয়ায় পাঠ্যপুস্তক রচনায় নতুন প্রেরণা এল। শুধু বাংলা নয়, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে লাগল হিন্দী, উর্দু, ফারসী, সংস্কৃত প্রভৃতি নানা ভাষার বই।

কেরী ও পঞ্চানন কর্মকারের নৈপুণ্যে বাংলা মুদ্রণের সৌকর্য দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগল। একে একে বহু বাঙালী ব্যক্তি ও সংস্থা পুস্তক প্রকাশে আগ্রহী হয়ে বাংলা বইয়ের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে তুলল। বাঙালী পাঠকের চাহিদা মেটাতে নানা বিষয়ের এবং নানা মানের বই পাওয়া গেল। কত বই এবং কি বিষয়ের বই প্রকাশনার প্রথম পর্বে ছাপা হয়েছিল—তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। প্রথম হিসাব পাই স্কুল বুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক রিপোর্টের পরিশিষ্টে। এই রিপোর্টে গভর্নমেণ্ট প্রেসে ছাপা বই এবং শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ও অন্যত্র মুদ্রিত বই যেসব প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৯৪ থেকে ১৮০৩ সালের মধ্যে, তাদের উল্লেখ করা হয়নি। হিসাব পাওয়া যায় ১৮০৪ থেকে ১৮১৮ সালের মধ্যে। প্রকাশিত বইয়ের তালিকা থেকে দেখা যায় এ-সময়ের মধ্যে ৬৫টি বই বেরিয়েছে। এই পনেরো বছরের উল্লেখযোগ্য প্রকাশক শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ দে ও লাল্লুজী। রামমোহনের প্রায়-সব বইয়ের প্রকাশক ছিলেন লাল্লুজী। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের নানা ধরনের পুস্তক প্রকাশ এবং বাংলা বইয়ের দোকান বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথম সচিত্র বাংলা গ্রন্থ 'অন্নদামঙ্গল' (১৮১৬) ছাপিয়ে বাংলা প্রকাশনের ক্ষেত্র প্রসারিত করলেন।

পরে স্কুল বুক সোসাইটি আর কোনো পরিসংখ্যান-সঙ্কলন করেনি। বাংলা বইয়ের নিয়মিত পরিসংখ্যান সঙ্কলনে প্রথম উদ্যোগী হন রেভারেণ্ড জেমস্ লঙ। খ্রীস্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৪০ সালে কলকাতা আসেন। কিছুদিনের মধ্যে বাংলা শিখে বাংলা বইপত্র সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠেন। তিনি নানা স্থানে অনুসন্ধান করে একে একে পরিসংখ্যান করতে থাকেন। তাঁর হিসাব থেকেই জানতে পারি ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে ৩০টি বাংলা বই বেরিয়েছিল; ১৮২২ থেকে ১৮২৬-এর মধ্যে বেরিয়েছে ২৮টি বই। ১৮৫২ সালে পাওয়া গিয়েছিল মোট ৫০টি নতুন বই। ১৮৫৩-৫৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৫১। বৃদ্ধির হারটা হঠাৎ বেশি মনে হয়। লঙ দীর্ঘকাল পরিশ্রমের পর একটি নির্ভরযোগ্য সটীক তালিকা বা 'ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ' সঙ্কলন করেন ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে। এই তালিকায় ১৭৯৫-১৮৫৪, এই ষাট-একষট্টি বছরে প্রকাশিত সব বাংলা বই ও পুস্তিকার (খ্রীস্টান ট্রাক্ট-সহ) বিবরণ পাওয়া যাবে। লঙ সাহেবের বিবরণ অনুযায়ী ঐ সময়ের মধ্যে ১,৪০০ বইপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। অর্থাৎ, বার্ষিক গড় ২৩টির বেশি নয়।

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত বাংলা বইপত্রের যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ তালিকা লঙ সাহেব সঙ্কলন করেছেন, তেমন এর পূর্বে বা পরে কখনও হয়নি। বাংলা বইপত্র সাতান্নর বিপ্লবকে কতটা প্রভাবান্বিত করেছে তা পর্যালোচনা করে দেখবার জন্য বাংলা সরকার লঙ সাহেবকে অনুরোধ করেছিল। লঙ প্রত্যেক প্রেসে গিয়ে বই ও পত্রিকা দেখে তাঁর রিপোর্ট লিখেছেন। সুতরাং পরিবেশিত তথ্য নির্ভর-যোগ্য। অবশ্য হিসাব নেওয়া হয়েছিল শুধু কলকাতায় ৪৬টি প্রেসে মুদ্রিত গ্রন্থের। ঐ বছর মোট ৩২২টি বই বেরিয়েছিল। বইগুলির বিষয়-বিভাগ এই: পঞ্জিকা—১৯, জীবনী ও ইতিহাস—১৫, খ্রীস্ট ধর্ম-সম্বন্ধীয়—৮, নাটক—৮; হিন্দু ধর্ম-বিষয়ক—৮৫; নীতিগল্প—১৯, বিজ্ঞান—৯; মুসলমানী বাংলা—২৩; পাঠ্যপুস্তক—৪৬; কাম-সম্বন্ধীয়—১৩; গল্প-উপন্যাস—২৮; আইন—৫; বিবিধ—১২; সংবাদপত্র—৬, সাময়িকপত্র—১২; সংস্কৃত-বাংলা—১৪। এসব বই প্রকাশিত হয়েছিল বিক্রির জন্য। এছাড়া বিনামূল্যে বিতরণের জন্য হিন্দুরা ৭,৭৫০ এবং খ্রীস্টানরা ১৬,৯৫০ কপি বই ছাপিয়েছিল। টাইটেল ক'টি তা জানা যায় না।

মোট ৩২২টি বই (টাইটেল)-এর ৫,৭১,৬৭০ কপি ছাপা হয়েছিল। বিনামূল্যে বিতরণের জন্য কপি যোগ করলে মোট কপির সংখ্যা দাঁড়ায় ৬,৫৬,৩৭০। গ্রামবাসী

বাঙালীর শতকরা মাত্র তিন ভাগ বই পড়তে পারে—এই ছিল লঙের বিশ্বাস। ২,২০,০০,০০০ বাঙালী নিরক্ষর থাকা সত্ত্বেও এত বই ছাপা হওয়াটা তাঁর বিস্ময়কর মনে হয়েছে। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে কলকাতার চীফ ম্যাজিস্ট্রেট ককবার্ন সাহেবকে লঙ জানান যে, গত দশ বছরে কুড়ি লক্ষ কপি বাংলা বই প্রচারিত হয়েছে প্রধানত কলকাতাকে কেন্দ্র করে কুড়ি মাইল বৃত্তের মধ্যে। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে ৩,০৩,২৭৫ কপি বাংলা বই ছাপা হয়েছিল। লঙের হিসাব থেকেই জানা যায় বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়'-এর দশটি সংস্করণে দু'বছরের মধ্যে বিক্রি হয়েছে ৬৩,০০০ কপি। চব্বিশ পৃষ্ঠার বইয়ের দাম ছিল তিন পয়সা।

বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে খ্রীস্টান মিশনারীদের দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ১৮২৩ থেকে ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মিশনারীদের উদ্যোগে খ্রীস্ট ধর্ম-বিষয়ক বই ও পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে মোট ৩৭,২৬,৮৫০ কপি। এর মধ্যে বই ১,১৩,৭৭৫ কপি; বাকিটা পুস্তিকা।

প্যারিস ইউনিভার্সাল এগজিবিশনে যেসব বাংলা বই পাঠানো হয়েছিল তারও একটি তালিকা লঙ সঙ্কলন করেছিলেন ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে। এই তালিকায় ১৮৬২ থেকে ১৮৬৬ সালের মধ্যে নির্বাচিত বাংলা বইয়ের উল্লেখ আছে। ভূমিকা অংশে বাংলা বই-সংক্রান্ত মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে। শেষাংশে সাময়িকপত্রের তালিকা ছাড়া কিছু কিছু ওড়িয়া, ফারসী ও অন্যান্য ভাষার বইয়ের বিবরণ জানা যায়।

এর দু'বছর আগে (১৮৬৫) পাদরী ওয়েঙ্গার ১,৪০০ বই ও ৩৯টি পত্রিকার একটি তালিকা সঙ্কলন করেছিলেন। আরও কিছু গ্রন্থবিবরণী বেরিয়েছিল, যা থেকে পরিসংখ্যান না পাওয়া গেলেও বাংলা প্রকাশনের ধারা সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে পারে। এ-বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্র হল বাংলা সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক তালিকা। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে 'প্রেস অ্যাণ্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুক্‌স্ অ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ করা হয়। নির্দিষ্ট সরকারী দপ্তরে নবপ্রকাশিত বইপত্র এই আইন অনুসারে জমা দিতে হয় এবং তারই ভিত্তিতে সঙ্কলিত হয় ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা। সুতরাং ১৮৬৭ সালের শেষভাগ থেকে বাংলা বইয়ের খবর মোটামুটি পাওয়া যায়। একজন বিশেষজ্ঞের মতে, ১৮০০ থেকে ১৮৬৬ পর্যন্ত ছাপা হয়েছিল প্রায় ১৩,০০০ বই (টাইটেল)।

সরকারী সূত্র থেকে জানা যায় ১৮৭০ সালে নতুন বাংলা বইয়ের সংখ্যা ছিল ৩৮৫; ১৮৮০ সালে ৮৯৮; ১৮৯০-এ ৭০৮; ১৯০০ সালে ৯০৭। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের সেন্সাসের ভাষা-সংক্রান্ত রিপোর্টে গ্রীয়ার্সন লিখেছেন—৪,৪৬,২৪,০৪৩

বাংলাভাষীর জন্য বিগত দশ বছরে ১,৭০৬টি বই প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ, বছরে গড়ে ১৭০টি বই।

এরপর থেকে কয়েক বছরের ব্যবধানে বাংলা বই প্রকাশের হিসাবটা এরকম :

বছর	বইয়ের সংখ্যা
১৯১০	১,১৯৪
১৯২০	১,১৭৭
১৯৩০	১,০২৯
১৯৪০	১,৮৮৪
১৯৪৭	১,০১৮
১৯৫০	৭৯৫

প্রায় দেড়শ বছর যাবৎ এদেশে যেসব বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছে তাদের সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা হয়নি। ১৮৩০ সাল থেকে প্রশাসনিক নির্দেশে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের দপ্তরে কিছু কিছু বইপত্র জমা পড়ত। সেইসব প্রকাশন এবং 'প্রেস অ্যাণ্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুক্স্ অ্যাক্ট, ১৮৬৭' অনুসারে প্রাপ্ত বইপত্র সবই চলে যেত লণ্ডনে, রাখা হত ব্রিটিশ মিউজিয়াম এবং ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই নিয়ম বজায় ছিল।

সুতরাং দেড়শ বছরের পুরনো বাংলা বই নিয়ে কেউ গবেষণা করতে চাইলে তাঁকে অবশ্যই লণ্ডনের লাইব্রেরি-দুটির সহায়তা নিতে হবে। স্বাধীনতার পরেও আমরা প্রকাশিত সব বইপত্র সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট হইনি। যেসব কেন্দ্রে বই জমা দেবার আইন আছে, সেখানেও সব বই জমা পড়ে না; যা জমা পড়ে তাও সংরক্ষণের সুব্যবস্থা নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দপ্তরে 'প্রেস অ্যাণ্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুক্স্ অ্যাক্ট' অনুসারে তিন কপি বই জমা পড়লেও এমন কোনো লাইব্রেরি নেই, যেখানে সবগুলি বই রাখা হয়। জাতীয় গ্রন্থাগারে অন্য-একটি আইন অনুসারে প্রকাশকদের বই জমা দেবার কথা। যে বই আসে সে বইও যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য সংরক্ষিত করা সম্ভব নয়।

স্বাধীনতার পূর্ববর্তী বাংলা বইয়ের জন্য আমাদের নির্ভর করতে হয় লণ্ডনের দুটি লাইব্রেরির উপর, স্বাধীনতার পরবর্তী বইয়ের জন্য আমাদের যেতে হবে আমেরিকায়। কারণ, সেখানকার প্রায় পনেরোটি লাইব্রেরি প্রায় সকল বাংলা বইপত্র সংগ্রহ করে সযত্নে সংরক্ষণ করবার ব্যবস্থা করেছে।

দেশ স্বাধীন হবার সময় ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে যত ভারতীয় প্রকাশন

আছে তাদের ভারত ও পাকিস্তানের জন্য ভাগ করে দেওয়া হবে বলে কথা ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ ভারত সরকার কিংবা দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী সেই আশ্বাসকে কার্যকর করবার জন্য কিছুই করেননি। কিছুকাল পূর্বে ব্রিটিশ সরকার নিঃশব্দে এবং বিনা প্রতিবাদে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির সংগ্রহ ব্রিটিশ লাইব্রেরির অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। নিজেদের প্রকাশিত বইপত্র সংরক্ষণের প্রতি আমরা যে কত উদাসীন, তা এই থেকেই বোঝা যায়।

যেসব বই আমরা সংরক্ষণ করিনি, তেমন কত মূল্যবান বই চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে তা কে বলতে পারে! পুরনো পুস্তক তালিকা দেখতে দেখতে এমন কত বইয়ের নামের উপরে চোখ আটকে যায়, যাদের হদিস এখন এদেশের কোথাও মেলে না। সাহিত্য, সমাজ, সাময়িক ঘটনা এবং আরও নানা বিষয়ের উপর বিচিত্র প্রকাশন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। লণ্ডের ক্যাটালগে একটি বই বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত তিন খণ্ডের 'চিত্রপুস্তক' বা দেশীয় ছবির অ্যালবাম। প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে বা তার পূর্বে। দেশীয় ছবির এরকম সংগ্রহ এখনকার দিনেও বড় একটা বের হয় না। তিন খণ্ডে মোট ২০২টি ছবি ছিল। ছবির বিষয় পুরাণের দেবদেবী এবং সমকালীন সামাজিক জীবন। পুস্তক সংরক্ষণে এখনও যদি আমরা তৎপর না হই, তবে ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা নিশ্চয়ই এই অবহেলার জন্য আমাদের দোষারোপ করবে।

বইপত্রের নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান সঙ্কলন করতে হলে একটি কেন্দ্রে দেশের সকল বই জমা পড়া অত্যাবশ্যক। পূর্বে এর সুযোগ ছিল না। ১৯৫৪ সালে এই উদ্দেশ্যে একটি আইন বিধিবদ্ধ করেন ভারত সরকার। আইনটি হল—'ডেলিভারী অব বুক্‌স্ (পাবলিক লাইব্রেরিস্) অ্যাক্ট'। প্রথমে আইনটি শুধু বই সম্বন্ধে প্রযোজ্য ছিল। পরে এটি সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের ক্ষেত্রেও প্রসারিত করা হয়। এই আইন অনুসারে ভারতের চারটি গ্রন্থাগার এক কপি করে প্রত্যেক প্রকাশিত বই ও পত্রিকা পাবার অধিকারী। এদের মধ্যে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার অন্যতম। এই গ্রন্থাগার থেকেই ভারতীয় প্রকাশনের পরিসংখ্যান সঙ্কলন করা হয় এবং একটি মুদ্রিত গ্রন্থপঞ্জীও প্রকাশ করবার কথা। ভারতীয় প্রকাশন শিল্পের ধারা সম্বন্ধে এখানকার পরিসংখ্যানই একমাত্র নির্ভর। কিন্তু এর মধ্যে প্রকাশন শিল্পের প্রকৃত রূপটি যে পাওয়া যায়—সেকথা বলা সম্ভব নয়। কয়েকটি কারণের জন্যে সব প্রকাশক তাঁদের সকল বইপত্র আইন অনুসারে জাতীয় গ্রন্থাগারে পাঠান না। প্রথমত, এই আইনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকেই ওয়াকিবহাল নয়;

দ্বিতীয়ত, ডাকমাশুল এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে অনেক প্রকাশকই ব্যয়ভার বহন করে বই পাঠাতে অনিচ্ছুক; তৃতীয়ত, আজকাল অনেক বইয়েরই দাম পঞ্চাশ থেকে দুশো টাকা পর্যন্ত। এত দামী বই প্রকাশকরা বেশ কয়েক কপি করে পাঠাতে অনিচ্ছুক। শুধু 'ডেলিভারী অব বুক্‌স্‌ অ্যাক্ট' অনুসারে নয়, 'প্রেস অ্যাণ্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুক্‌স্‌ অ্যাক্ট' অনুযায়ীও তিন থেকে পাঁচ কপি করে রাজ্য সরকারকে দিতে হয়; চতুর্থত, এত বই দিয়েও প্রকাশকরা বিনিময়ে কোনরূপে উপকৃত হন না।

জমা-দেওয়া বইগুলি যদি দ্রুত ক্যাটালগ করা হত, অথবা যথাসময়ে বইয়ের বিবরণ গ্রন্থপঞ্জীতে ছাপা হত, তাহলে বইগুলি প্রচারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেত। অন্যান্য অনেক দেশেই বই জমা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বত্বাধিকারীর কপিরাইট নথিভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু ভারতে কপিরাইট নথিভুক্ত করার জন্য পৃথক কপি পাঠাতে হয় নতুন দিল্লীর কপিরাইট অফিসে। পত্রপত্রিকার ক্ষেত্রেও রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রতিটি কপি প্রেস রেজিস্ট্রারকে পাঠাতে হয়। সুতরাং দরিদ্র দেশের প্রকাশকরা তাঁদের বইপত্রের এতগুলি কপি পাঠিয়েও পরিবর্তে কোনভাবেই উপকৃত হন না। যেসব বই ও পত্রপত্রিকা জমা দেওয়া হয়, তাদেরও সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। জমা দেবার কপির সংখ্যা কমানো যেতে পারে—যদি প্রেস রেজিস্ট্রার ও কপি-রাইটের দপ্তর জাতীয় গ্রন্থাগারের চৌহদ্দির মধ্যে স্থাপিত হয়।

আমাদের দেশে প্রকাশন শিল্পের পরিসংখ্যানের একমাত্র সূত্র জাতীয় গ্রন্থাগার। কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকায় প্রকাশকদের সংগঠন এতই সুসংবদ্ধ যে তাঁরা নিজস্ব পরিসংখ্যান সঙ্কলন করে প্রকাশ করেন। সুতরাং ঐসব দেশে দুটি সূত্র থেকে প্রকাশনের পরিসংখ্যান পাওয়া যায়।

পূর্বেই বলেছি, প্রকাশন শিল্প সম্বন্ধে আমরা শুধু জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃক সঙ্কলিত পরিসংখ্যান পাই। স্বভাবতই এই পরিসংখ্যানে সেসব বইয়েরই হিসাব পাওয়া যায়, যাদের জমা দেওয়া হয়েছে। জমা পড়েনি—এমন বইয়ের সংখ্যা কম নয়। তাই আমাদের আলোচনা থেকে ভারতীয় তথা বাংলা বইয়ের যে সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে তা স্বভাবতই সম্পূর্ণ নয়।

আলোচনার সুবিধার জন্য বর্তমান শতকের প্রকাশনকে দুটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথমটি ১৯০১ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্বের শুরু ১৯৫৮ থেকে। প্রথম পর্বে বিশ্লেষণাত্মক কোনো পরিসংখ্যান সঙ্কলিত হয়নি। প্রকাশিত বইয়ের বিবরণ সংগ্রহ করবার মত কোনো উৎসাহী গ্রন্থপ্রেমী ছিলেন না, বিগত শতকে

যেমন ছিলেন লঙ। অবশ্য সরকারী প্রকাশন ত্রৈমাসিক তালিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে নতুন বইপত্র সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহ করেছে। প্রথম পর্বে প্রকাশিত বইপত্রের আধুনিক রীতিতে সঙ্কলিত পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। শুধু দেখা যায় বাংলা বইয়ের সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে। কোনো এক বছর বেশি বই বেরিয়েছে, আবার পরের বছরেই তা কেন কমে যায় এর ব্যাখ্যা পাওয়া কঠিন। ১৯৫০-এ কম বই প্রকাশের কারণটা অবশ্য বোঝা যায়। দেশবিভাগের পর নানা সমস্যায় বিব্রত লেখক, প্রকাশক ও পাঠক বই প্রকাশের বিষয়ে যথেষ্ট দৃষ্টি দিতে পারেননি। সুতরাং সে-বছর কম বই পাওয়াটা স্বাভাবিক। ১৯০১ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত বাংলা বই প্রকাশের গড ১,১৫০ থেকে ১,১৮০ টাইটেলের মধ্যে। পুস্তক পরিসংখ্যান সঙ্কলনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় ১৯৫৮ সাল থেকে। 'ডেলিভারী অব বুক্স্ অ্যাক্ট' অনুসারে বই জমা পড়বার পর 'জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী' প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়। এখানেই প্রথম আমরা আধুনিক পদ্ধতি অনুযায়ী পরিসংখ্যান পাই।

১৯৫০ সালে ৭৯৫টি বই পাওয়া গিয়েছিল—একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। পরবর্তী হিসাব এইরূপ :

সাল	বইয়ের সংখ্যা
১৯৬১-৬২	২,০৯৩
১৯৬৪-৬৫	২,৩০২
১৯৬৬-৬৭	১,১৩৭
১৯৬৮-৬৯	২,৬৫৪
১৯৭১-৭২	১,২৮৪
১৯৭৮-৭৯	১,০৩৯
১৯৮৩-৮৪	১,৮২২

এই হিসাব থেকে ক্রমোন্নতির লক্ষণ ধরা পড়ে না।

শুধু বাংলা বইয়ের হিসাব থেকে আমাদের প্রকাশনের তুলনামূলক আলোচনা করা যায় না। তাই আমরা অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত বইয়েরও একটা পরিসংখ্যান দিলাম। এটি ১৯৮২-৮৩ সালের :

ভাষা	বইয়ের সংখ্যা
অসমীয়া	৩৫০
বাংলা	১,০৩২
ইংরেজী	৫,৮৫৬

ভাষা	বইয়ের সংখ্যা
গুজরাটী	৭০৮
হিন্দী	২,৮১১
কানাড়ী	৪১৭
মালয়ালী	৬০৭
মারাঠী	১,২৬৪
ওড়িয়া	৬১১
পাঞ্জাবী	৩০৮
সংস্কৃত	৯৭
তামিল	১,১৫২
তেলেগু	১,০৩০
উর্দু	৩০০
অন্যান্য	১১০

পূর্বে বাংলা প্রকাশনের সংখ্যা ছিল ইংরেজীর পরেই। তারপরে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে হিন্দী, বাংলা ছিল তৃতীয়। কিন্তু এখন বাংলার স্থান আরও নিচে। অবশ্য দেশবিভাগকে কারণ হিসাবে নির্দেশ করা যেতে পারে। কিন্তু ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশের জন্য বই সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতা। এখনও বাংলাদেশে খুব বেশি পরিমাণ বই প্রকাশিত হয় না।

ছোট দেশে জনসংখ্যার চাপ থাকলে শুধু জমির উপর নির্ভর না করে নানারকম যন্ত্রশিল্প প্রাধান্য লাভ করে এবং জীবনযাত্রার তাগিদেই বেশি করে বই ছাপা হয়।

১৯৮১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা ছিল ৫,৪৫,৮০,৬৪৭। এর মধ্যে ৮৫ শতাংশ বাংলাভাষী। এবং তাদের মধ্যে সাক্ষরের সংখ্যা শতকরা ৪৪.৮৮। মোট ১,০৩২ বাংলা বই ১৯৮২-৮৩তে প্রকাশিত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে মোট সাক্ষরের সংখ্যা ২,২৪,১২,৫৬৯। প্রায় ২১,৭১৭ সাক্ষরের জন্য ঐ বছর পাওয়া গেছে মাত্র একটি বই।

এই হিসাব শুধু পশ্চিমবাংলার সাক্ষরদের জন্য। কিন্তু সেন্সাসে সাক্ষরের যে হিসাব দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে শুধু বাংলাভাষীদের ধরা হয়নি। বাংলাদেশে বসবাসকারী মোট সাক্ষরের সংখ্যা এটি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, পশ্চিম-বঙ্গের বাইরেও বহু বাংলাভাষী আছে এবং তাদের মধ্যে অনেকেই সাক্ষর। তাদের বাংলা বইয়ের চাহিদাও পশ্চিমবঙ্গকেই মেটাতে হয়। সুতরাং অনুমান করা

যেতে পারে একুশ হাজারেরও বেশি সংখ্যক সাক্ষরগোষ্ঠীর জন্য মাত্র একটি করে বাংলা বই পাওয়া যায়। অন্য কয়েকটি দেশের সঙ্গে বাংলাভাষীদের বই পড়বার সুযোগ তুলনা করা যেতে পারে :

দেশ	একটি বই কত লোকের জন্য
বাংলাদেশ	১,৬০,৬৩৩
চেকোস্লোভাকিয়া	১,৪৫৫
ফ্রান্স	১,৪৫০
ভারত	৬১,৮১৬
জাপান	২,৭৭২
সুইডেন	৯৭০
গ্রেট ব্রিটেন	১৩০

ব্রিটেনের সঙ্গে আমাদের তুলনা নাই-বা করলাম। এশিয়ার দেশ জাপান জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের ভাষার (জাপানী) বই ব্যবহার করে। স্বাধীন জাতি হিসাবে আমাদেরও সেই লক্ষ্য থাকা উচিত। জাপানের মতন মান অনুযায়ী বাংলা প্রকাশনকে উন্নত করতে হলে এখন যে-পরিমাণ বই বের হয় তার চেয়ে অন্তত দশ-এগারো গুণ বেশি বই প্রকাশ করতে হবে। এর অর্থ এই—প্রকাশন সংস্থা, কাগজ, মুদ্রাযন্ত্র, লেখক, শিল্পী, দপ্তরী প্রভৃতি সবই ততগুণ বেশি হওয়া আবশ্যক।

বইয়ের সংখ্যা (টাইটেল) দিয়ে সম্পূর্ণ অবস্থাটা উপলব্ধি করা যায় না। দেখতে হবে যে, জীবনের চাহিদা মেটাবার মতন বই কোন্ বিষয়ে কি পরিমাণ বের হয়। ১৯৮৩-৮৪ সালে বাংলা বইয়ের বিষয়-বিভাগটি থেকে এই দিকটা বোঝা যাবে :

বিষয়	বইয়ের :
একাধিক বিষয়ের বই, রেফারেন্স ইত্যাদি	২৯
দর্শন, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি	৫৫
ধর্ম	৭২
সমাজবিদ্যা	১৯২
ভাষা, বিজ্ঞান, অভিধান ইত্যাদি	৩৮
বিজ্ঞান	৩৩

বিষয়	বইয়ের সংখ্যা
প্রযুক্তিবিদ্যা	৪১
শিল্পকলা	৮৯
সাহিত্য	৭৯৬
ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি	৩৭৭
অন্যান্য	১০০

এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাবে যে, সাহিত্যের বই, অর্থাৎ চিত্তবিনোদনের উপকরণ সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার মত জাতি-গঠনমূলক বই বেরিয়েছে মাত্র ৭৪টি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বই ছাড়া দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয়। সেই দুটি শ্রেণীর বইয়ের প্রতি আমাদের উদাসীনতা।

এই হিসাব থেকে দেখা যাবে যে-কোনো কারণেই হোক এই বছর বাংলা বইয়ের সংখ্যা অনেক বেশি মনে হয়।

বিভিন্ন বছরে প্রকাশিত যেসব পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে, তার অর্থ এই নয় যে, বইগুলি ঠিক ঐ বছরেই প্রকাশিত হয়েছে। বুঝতে হবে যে, ঐ বছর বইগুলি জমা পড়েছে, প্রকাশিত হয়েছে হয়ত পূর্ববর্তী কয়েক বছরে। কিন্তু এরপরের পরিসংখ্যানে উল্লিখিত সংখ্যাগুলির অর্থ এই যে, ঐসব বই ঐ নির্দিষ্ট বছরেই প্রকাশিত হয়েছে। এক বছরের হিসাব থেকে হয়ত বিষয়টি পরিস্ফুট না-ও হতে পারে। তাই আমরা পাঁচ বছরের বিষয়-বিশ্লেষণমূলক হিসাব দিলাম (পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। এই পাঁচ বছর হল ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত।

পূর্বে বলা হয়েছে, বই এখন শুধু শিক্ষা বা চিত্তবিনোদনের জন্য নয়। জীবিকার্জনের জন্য এবং সভ্য নাগরিক হিসাবে দিনযাপনের জন্য বই অপরিহার্য। যে-কোনো বৃত্তিতে বই থেকে সাহায্য গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। একালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রাধান্য। ব্যক্তিগত জীবনে এবং জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই দুটি বিষয়ের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। অথচ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উপর বাংলা বইয়ের সংখ্যা নগণ্য। অর্থাৎ বাংলা বইয়ের উপর নির্ভর করে কেউ ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, শিক্ষক, মিস্ত্রী প্রভৃতির বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে না' এখানে আমরা ১৯৭১-৭৫—এই পাঁচ বছরের যে হিসাব দিয়েছি, তা থেকে দেখা যায় পাঁচ বছরে মোট প্রকাশিত বাংলা বইয়ের সংখ্যা ৪,৭৮৬। এর মধ্যে সাহিত্যের বই ২,৬৩১ বা মোট উৎপাদনের ৫৪.৯৭%। সেই তুলনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বই মাত্র ৮৯টি করে, অর্থাৎ এই দুটি বিষয়ে শতকরা মাত্র ১.৮৬ ভাগ বই।

বিষয়	১৯৭১	১৯৭২	১৯৭৩	১৯৭৪	১৯৭৫
একাধিক বিষয়ক ও রেফারেন্স জাতীয় বই	২০	১৩	৩২	২০	১২
দর্শন, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি	২৬	১৬	৩৩	২১	২৬
ধর্ম	৬৫	৬৫	৮২	৫১	৭৮
সমাজবিদ্যা, সমীক্ষা, পরিসংখ্যান	২২	২৯	৯	২২	৩৪
রাজনীতি, অর্থনীতি	৪০	৪২	১৮	১৭	১৩
আইন, প্রশাসন, সমাজকল্যাণ ইত্যাদি	৯	৪	২	৩	৫
যুদ্ধবিদ্যা	২	—	—	১	—
শিক্ষা	৭	১২	১২	১০	৫
ব্যবসা, যোগাযোগ, যানবাহন	৯	৫	—	—	১
জাতিবিজ্ঞান, লোকাচার, রীতিনীতি	৮	৮	৮	৩	৫
ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ ইত্যাদি	১৮	৮	৭	৯	৫
গণিতশাস্ত্র	১	৮	—	১	—
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান	৩১	২৬	৮	৬	১২
চিকিৎসা বিজ্ঞান	১১	১২	১০	১০	১৩
প্রযুক্তিবিদ্যা	১০	২	২	১	—
কৃষি, পশুবিজ্ঞান ইত্যাদি	৪	৪	১০	৩	৫
গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান	—	৪	—	২	১
বাণিজ্যিক প্রশাসন ইত্যাদি	১১	৫	—	৪	২
ললিতকলা, সিনেমা ইত্যাদি	২৯	২৯	২৪	২৫	৩৩
খেলাধুলা	৮	৪	৩৮	২৫	১০
সাহিত্য	৪৩৯	৫১১	৬৮৪	৫০১	৪৯৬
ভূগোল ও ভ্রমণ	৭০	১৭	২০	২১	১০
ইতিহাস, জীবনী ইত্যাদি	১৩১	১৪৬	১৪১	১০৯	৭৭
মোট	৯৭১	৯৭০	১১৪০	৮৬২	৮৪৩

প্রকাশনের ক্ষেত্রে আমাদের স্থান কোথায়, তা জানতে হলে তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা উপলব্ধি করা যাবে। এরপর আমরা ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত বইয়ের হিসাব বিশ্লেষণ করে তুলনামূলক পরিসংখ্যান দিলাম।

ভাষা	বইয়ের মোট উৎপাদন (১৯৭৩)	সমাজবিদ্যা %	বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা %	সাহিত্য %
বাংলা	১,১৪০	৪·২৪	২·৬৩	৬০
হিন্দী	১,৮১৪	৫·৪১	৩·৩৯	৬৭·৮৬
মারাঠী	১,০৮৫	৩৯·৬৯	১৭·৮৬	২৩·৯৮
তামিল	১,০৮৯	১২·১৬	৮·১১	৫৪·৩৭
জাপানী	৩৫,৮৫৭	২৫·৮০	২৪·৬১	২১·৮৮
হাঙ্গারীয়ান	৭,৫৮১	২৪·৯৮	৩৬·০৯	১৬·৩৫
ফরাসী	২৭,১৮৬	২৩·৫৭	২৩·৬২	২৬·১৪
রুমানিয়ান	১০,১০০	২৭·৯২	৩৯·৫০	১৫·৯৪
পোলিশ	১০,৭৪৪	১৭·৮৭	৪৯·০৬	১৫ ৩৬
সুইডিশ	৮,২৪২	১৫·৪৮	৩০·৬৮	২৯·৪৯
ইংরেজী (ব্রিটেন)	৩৫,১৭৭	১৯·৩৯	২৫·২১	২৩·৯৭
ইংরেজী (আমেরিকান)	৮০,৭২৪	১১·৩১	৯·৪৫	১০·২৩
রাশিয়ান গোষ্ঠী	৮০,১৯৬	২৬·২৭	৫০·০৩	১০·৭৪

বাংলায় মোট প্রকাশনের মাত্র ২·৬৩ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বই। অথচ জাতিগঠনের জন্য উন্নয়নশীল দেশে এই শ্রেণীর বই অত্যাবশ্যক। বাংলা বইয়ের ৬০% সাহিত্য বিষয়ক। হিন্দীতে সাহিত্যের বই আরও বেশি—শতকরা ৬৭%। মহারাষ্ট্র শিল্পসমৃদ্ধ, তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা-বিষয়ক বইয়ের সংখ্যায়। মোট মারাঠী বইয়ের ১৭·৮৬ শতাংশ এই দুটি বিষয়ের উপর। ছোট কিন্তু উন্নত দেশগুলিতে সাহিত্য অপেক্ষা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উপর বেশি বই বের হয়। জাপানে শতকরা ২৪·৬১; হাঙ্গারীতে শতকরা ৩৬·০৯; রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড ও সুইডেনে যথাক্রমে শতকরা ৩৯·৫০, ৪৯·০৬ এবং ৩০·৬৮। রাশিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর বইয়ের অর্ধেকেরও বেশি এই দুটি বিষয়ের উপর। য়ুরোপের তো বটেই, পৃথিবীর সাংস্কৃতিক পীঠস্থান বলে স্বীকৃত ফ্রান্সেও মোট প্রকাশনের ২৬·১৪%এর বেশি বই সাহিত্য-সম্পর্কিত নয়।

জাতিগঠনের জন্য সমাজবিদ্যার বইও বিশেষ প্রয়োজন। এক্ষেত্রেও আমরা

পিছিয়ে আছি। একমাত্র মারাঠীতে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক বই বেরিয়েছে সমাজ-বিদ্যার উপর।

প্রয়োজনের জিনিস নিজের ভাণ্ডারে না থাকলে আমরা ধার করে কাজ চালাই। সমাজবিদ্যা ও বিজ্ঞানের বই আমাদের নেই। এটাই স্বাভাবিক যে, ঐ বিষয়ের বই আমরা অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ করে চাহিদা মেটাবো। কিন্তু অনুবাদের ক্ষেত্রেও সাহিত্য-গ্রন্থের উপরেই ঝোঁক দেখা যায়। ১৯৭৮-এ ভারতে ৮৭৫টি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ৩৮৯টি সাহিত্য-বিষয়ক বই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বই মাত্র ৪৮।

বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যের পক্ষেও এই কথা প্রযোজ্য। আমরা সাহিত্য-গ্রন্থের বই বেশি অনুবাদ করি এবং সেসব অনুবাদের মানও বিশেষ উন্নত নয়। অনেক সময়ই মূল ভাষা থেকে অনুবাদ না করে ইংরেজী অনুবাদ থেকে ভাষান্তরিত করা হয়।

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়েছি যে, বাংলা প্রকাশনে সাহিত্য-গ্রন্থেরই প্রাধান্য। সাহিত্য-গ্রন্থের সিংহভাগই অধিকার করেছে গল্প-উপন্যাস। চিন্তাশীল প্রবন্ধের বই—যা পাঠকের মনকে উদ্দীপ্ত করতে পারে, তেমন বইয়ের সংখ্যা কম। বেশ কয়েক বছর পূর্বে সাহিত্য-গ্রন্থগুলি বিশ্লেষণ করে যা দেখা গিয়েছিল তা এখানে জানানো হল :

বছর	কবিতা	নাটক	গল্প-উপন্যাস	প্রবন্ধ	মোট
১৯৬৩-৬৪	১০২	১০৩	৩৫৩	৮৮	৬৪৬
১৯৬৪-৬৫	৭৩	১০৫	২৭৮	৮০	৫৩৬
১৯৬৫-৬৬	৯১	৩৬	৩৭৬	৭৩	৫৮৪
১৯৬৬-৬৭	৮১	৯৩	৩২৭	৭৪	৫৭৫
১৯৬৭-৬৮	৯৯	৬৪	৩৪৩	৪৬	৫৫২

এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট দেখা যাবে যে, পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা মাথাপিছু বইয়ের সংখ্যা অনেক কম। এত কম যে, তা দিয়ে জীবনের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব নয়। তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, স্বাধীনতার পর থেকে এত বছর ধরে আমরা তো জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু উন্নতি করেছি। একথা অস্বীকার করা যায় না। এই কয়েক দশকে আমরা এমন অনেক কাজ করেছি যা পূর্বে কখনও হয়নি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার বইয়ের সহায়তা এইসব কাজে অপরিহার্য। বই পেলাম কোথায়? এর

উত্তরে বলা যায় যে, আমদানী-করা বিদেশী বই দিয়ে আমরা কাজ করেছি। স্বাধীনতার পর থেকে বিদেশী বইপত্রের আমদানী যে কিরূপ দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, তা এরপরের হিসাব থেকে দেখা যাবে :

বছর	আমদানী-করা বইয়ের মূল্য
১৮৬৯-৭০	১০,৫৯,৮১২ টাকা
১৮৮৯-৯০	২১,৫০,২৬৬ ,,
১৯২০-২১	৬৫,৯৯,৯৮৯ ,,
১৯৩০-৩১	৬০,৯১,৪০৫ ,,
১৯৪৬-৪৭	৪৮,৪২,৪৯৫ ,,
১৯৬১-৬২	২,৩৪,২৮,৪৭৯ ,,
১৯৬৮-৬৯	৮,৬৪,০০,০০০ ,,
১৯৭২-৭৩	৪,০৩,৬৯,০০০ ,,
১৯৭৫-৭৬	৯,৬০,০০,০০০ ,,

এই হিসাব থেকেই দেখা যাবে, বিদেশী বইয়ের উপর আমরা কত নির্ভরশীল। টাকা দিলেই প্রয়োজনীয় বই কিনতে পারি, সুতরাং নিজেদের প্রকাশন শিল্পকে সমৃদ্ধ করে তোলবার কোনো উদ্যোগ নেই। জাতিগঠনমূলক যেসব বইয়ের দরকার তা লেখা ও ছাপার সমস্যা এড়িয়ে আমরা অতি-সহজে টাকার বিনিময়ে বিদেশ থেকে বই এনে নিজেদের কাজ চালাই।

অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে যে, আমরা শুধু বই আমদানী করি না, রপ্তানীও করি। পৃথিবীর প্রায় ৮০টি দেশে ভারতীয় বই রপ্তানী করা হয়। বলা বাহুল্য, এরা সব ইংরেজী ভাষায় লেখা। আমেরিকা অন্যতম প্রধান আমদানী-কারক দেশ। প্রাচ্যবিদ্যা-বিষয়ক বই, বিশ্ববিদ্যালয়-মানের পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদির চাহিদাই বেশি। চাহিদার মূল কারণ, তুলনামূলকভাবে বইগুলি দামে সস্তা। ১৯৭৫-৭৬ সালে রপ্তানী-করা বইয়ের মূল্য ছিল ২ কোটি ৮ লক্ষ টাকা। ১৯৮০-৮১ সালে এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮ কোটি টাকা। ভারতে উৎপাদিত বইয়ের মধ্যে উঁচুমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বইয়ের সংখ্যা নগণ্য।

আমদানী ও রপ্তানীর হিসাব থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ভারতে এখনো ইংরেজী ভাষারই প্রাধান্য। সেইজন্য আমাদের পুস্তক উৎপাদনের যে ক্ষমতা রয়েছে তার এক বৃহৎ অংশ প্রয়োগ করা হয় ইংরেজী ভাষায় বই প্রকাশের জন্য। বিদেশী ভাষায় ছাপা বইয়ের সংখ্যা স্বাধীনতার পর থেকে ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

বছর	ভারতীয় ভাষায় বই	বিদেশী ভাষায় বই (ইংরেজী)	মোট
১৮৮৯-৯০	৮,৪৬১	৯১৭	৯,৩৭৮
১৯৩০-৩১	১৪,০৭৪	২,৩৫৩	১৬,৪২৯
১৯৬১-৬২	১১,৭১৫	৯,৩৬১	২১,০৭৬
১৯৭৬-৭৭	১১,৮০১	১০,১২১	২১,৯২২
১৯৭৮-৭৯	১১,৪৬৯	৭,০৮৯	১৮,৫৫৮

এখানে আমরা ভারতীয় প্রকাশনের সামগ্রিক চিত্রটি দিয়েছি। পশ্চিমবঙ্গে কত বিদেশী বই আমদানী করা হয়েছে তার পৃথক কোনো হিসাব পাওয়া যায় না।

বাংলা এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় বইয়ের সংখ্যা এত কম কেন তার মূল কারণ কী দেখা যাক। প্রথমত, বাংলায় আধুনিক মুদ্রণ-পদ্ধতি এবং প্রকাশন-শিল্প এসেছে য়ুরোপের প্রায় চারশত বৎসর পরে। সুতরাং চার শতক পশ্চাতে থেকে আমাদের যতটা উদ্যোগী হয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল, তা আমরা করিনি। না করবার প্রধান কারণ ব্রিটিশ শাসনের পর ইংরেজী ভাষার আধিপত্য বিস্তার। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরেজী ভাষা শিখতে মধ্যবিত্ত বাঙালীরাও আগ্রহী ছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে উন্নত করবার জন্য তারা তেমন উৎসাহবোধ করেনি। কারণ, ইংরেজী ছিল শাসকের ভাষা, শিখতে পারলে সরকারী দপ্তরে এবং ব্রিটিশ সওদাগরী অফিসে চাকরি পাওয়া যাবে। বিদেশী সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'কলিকাতা-মাদ্রাসা'। মুসলমান শাসনের অবশেষ হিসাবে তখনও ছিল ফারসী ভাষার প্রাধান্য। তাই এজাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা ছিল স্বাভাবিক। হিন্দুদের কথা বিবেচনা করে কোম্পানী সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। তখনকার বাঙালী সমাজের পুরোধা রামমোহন রায় প্রাচীন ভাষায় শিক্ষারীতির পুনঃপ্রবর্তনের প্রতিবাদ জানালেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক শিক্ষার মাধ্যম কী হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করবার জন্য একটি কমিটি গঠন করলেন। কমিটির মধ্যে দুটি ভাগ হয়ে গেল। একদল বললেন ফারসী ও সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু আরেক দলের অভিমত হল এই যে, শিক্ষাকে আধুনিক করতে হলে মাধ্যম হওয়া উচিত ইংরেজী। এই দুই মত বিচার করে লর্ড মেকলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, আধুনিক ভাবনার স্রোত ভারতে প্রবহমান করতে হলে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষাদান ব্যতীত গত্যন্তর নেই। মেকলে ছিলেন বড়লাটের পরিষদের সদস্য। লণ্ডন থেকে বেন্থাম একটি

চিঠিতে ভারতে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য বেন্টিঙ্ককে লিখেছিলেন। সুতরাং বেন্টিঙ্ক মেকলের অভিমত গ্রহণ করে ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের ৭ মার্চ একটি ঘোষণা জারি করে সরকারী নীতি জানিয়ে দিলেন যে, এখন থেকে শিক্ষার মাধ্যম হবে ইংরেজী এবং সেই ভাষাই হবে আধুনিক ভাবনা প্রচারের সহায়ক।

এই সিদ্ধান্তের ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে গেল। ইংরেজী শুধু শিক্ষার মাধ্যম হল না, সেই বিদেশী ভাষা হল আমাদের জীবনের ভাষা। অর্থাৎ, জীবিকার্জনের সহায়ক। শুধু চাকরির ক্ষেত্রে নয়, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, ফিটার, মিস্ত্রী ইত্যাদি সকল বৃত্তিতেই ইংরেজী বইয়ের সাহায্য ছাড়া চলে না। বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিখতেই হত, সুতরাং সহজলভ্য ইংরেজী বইয়ের সহায়তা গ্রহণ করতে বাধা কোথায়? পরিণামে বাংলায় জীবনধারণের জন্য নিত্য-প্রয়োজনীয় বই রচনার ও প্রকাশনার জন্য কোনো উদ্যম সৃষ্টির সুযোগ রইল না। রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শক্তির নিকট আমরা ছিলাম পরাধীন, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ইংরেজী ভাষা আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করল। সেই আধিপত্যের হাত থেকে এখনও আমরা মুক্তিলাভ করিনি। বাংলাকে সরকারী ভাষার মর্যাদা শুধু সরকারী ফাইলে নিবদ্ধ রাখলে কি হবে? তাকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী করে তোলবার জন্য পরিকল্পনা-অনুযায়ী কোনো কাজ এখনও শুরু হয়নি। অথচ বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত প্রকাশশক্তি আশ্চর্যরূপে সমৃদ্ধ। আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষা যথার্থ মর্যাদা লাভ করেনি। রাজা লক্ষ্মণ সেনের আমলে রাজভাষা ছিল সংস্কৃত; তারপরে মুসলমান আমলে হল ফারসী, ইংরেজ আমলে ইংরেজী। এখনও বিদেশী ভাষাই বাংলাকে দাবিয়ে রেখেছে।

ইংরেজী ভাষার উপর আমাদের অশ্রদ্ধা নেই। কিন্তু কোনো দেশের সমগ্র জনসাধারণ একটা বিদেশী ভাষাকে আয়ত্ত করে নিজেদের ভাষা বলে গ্রহণ করতে পারে না। পারে সেইসব জাতি—যাদের নিজস্ব ভাষা সমৃদ্ধমান নয়, যাদের সাহিত্য ঐতিহ্যপূর্ণ নয়। যেমন আমরা দেখি আফ্রিকায়।

ইংরেজী ভাষা আমাদের নিকট পৃথিবীর জানালা। সেই পথ দিয়েই এসেছে বাইরের আলো, নতুন নতুন কত ভাবধারা। পৃথিবীর সকল দেশের সব বিখ্যাত লেখকের রচনা এই ভাষার মধ্য দিয়ে আমরা অনায়াসে আস্বাদন করতে সক্ষম। এর ফলে আমাদের বই কেনার জন্য যে অল্প পরিমাণ টাকা খরচ করা সম্ভব, তার অধিকাংশই ব্যয় হয় ইংরেজী বই কিনতে। আর সবচেয়ে বড় কথা, যে ভাষার

বই জীবিকার্জনে সহায়তা করে—তার প্রতিই অজান্তে আমরা আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। ইংরেজী বই এবং ইংরেজী ভাষার চর্চা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে—একথা আমরা বলব-না। কিন্তু তা সীমাবদ্ধ থাক উচ্চশ্রেণীর পণ্ডিতমহলে। তাঁরা তাঁদের আহৃত জ্ঞান বাংলা ভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করে দেবেন।

আমাদের দেশে হয়েছে অন্যরকম। বাঙালী পণ্ডিতরাও তাঁদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান বহুল-প্রচারের উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করেন ইংরেজীতে। সুতরাং যদিও স্বাধীনতার পরে স্নাতক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হয়েছে বাংলা, তথাপি বিভিন্ন বিষয়ে পণ্ডিতদের দ্বারা মৌলিক গ্রন্থ রচিত হয়নি। বাংলায় ছাত্রছাত্রীদের জন্য যেসব বই পাওয়া যায় তাদের অধিকাংশই পাশ করবার উদ্দেশ্যে লেখা, সত্যিকারের জ্ঞান অনুশীলনের জন্য নয়। এর ফলে আধুনিক প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা মননশীলতা এবং চিন্তাশক্তির গভীরতা ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে। দেশের পক্ষে এর পরিণতি হবে দুর্ভাগ্যজনক।

এইসব সমস্যা বহুলাংশে এড়ানো যেত যদি ১৮৩৫ সালের 'মেকলে-মিনিটস্' দেশীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করত। বিশ্বের আধুনিক চিন্তাধারা কি বাংলা ভাষার মধ্য দিয়েই প্রচার করা চলত না? প্রাচীন সংস্কার ও মানসিক জীর্ণতা থেকে মুক্তি পেতে হলে আধুনিক চিন্তাধারা যে অত্যাবশ্যক ছিল, এ-বিষয়ে রামমোহনের সঙ্গে আমরাও একমত। কিন্তু সেদিন যদি দেশীয় ভাষাকে শিক্ষার বাহন করে তার মধ্য দিয়ে আধুনিক চিন্তাধারাকে প্রচার করা হত তাহলে আজ আমাদের বাংলা বইয়ের দুর্ভিক্ষে ভুগতে হত না এবং ইংরেজীর এই আধিপত্য খর্ব করা যেত সহজেই। স্বাধীনতার পরেও ইংরেজীর যে কত প্রাধান্য, তা শুধু মুখের কথায় না বলে পরিসংখ্যান দিয়ে দেখানো যাক। ১৯৫৮ থেকে ১৯৭২ এই কয় বছরের মধ্যে ভারতে মোট ইংরেজী বই প্রকাশিত হয়েছিল ৫৩,২১২; হিন্দী ২৬,৭৮২ এবং বাংলা মাত্র ১৬,২৩৪।

শুধু ইংরেজীর আধিপত্য দূর করাটাই বড় কথা নয়। এই আধিপত্যের ফল হয়েছে সুদূরপ্রসারী। দেশের জনসাধারণ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে। একদল ইংরেজী জানে, আরেকদল ইংরেজী জানে না। যারা ইংরেজী জানে তারাই দেশ-শাসন এবং জনতার ভাগ্য নির্ধারণ করে। দেশের বৃহত্তর অংশ জাতিগঠনের কাজে সহায়তা করতে পারে না, একমাত্র শ্রমিকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া। অথচ ইংরেজী না জানলেই যে কেউ নির্বোধ—একথা বলা চলে না। আর এ-আশাও করা উচিত নয় যে, দেশের সকল লোক একটি বিদেশী ভাষাকে আয়ত্ত

করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে পারবে। এই যে দেশের লোকের মধ্যে একটি বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করা যেত যদি দেশীয় ভাষায় আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল বই পাওয়া যেত। বই নেই, বই পড়বার সুযোগ নেই, সুতরাং যারা সাক্ষর হবার সুযোগ পায় তারাও ধীরে ধীরে আবার নিরক্ষরতার অন্ধকারে ডুবে যায়। দেশের জনসাধারণকে একইরকম শিক্ষায় এবং একইরকম ভাবনায় ঐক্যবদ্ধ করবার ব্যবস্থা নেই বলেই জাতীয় ঐক্য বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ইংরেজ আমলের পূর্বে সকলেই সাক্ষর ছিল না, কিন্তু দেশের সাংস্কৃতিক ভাবনার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা হত যাত্রা, কথকতা, চণ্ডীমঙ্গলের আলোচনা ইত্যাদির সাহায্যে। সেইসব পুরনো রীতি আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। প্রত্যেকের হাতে উপযুক্ত বই তুলে ধরা এবং জনসাধারণের জন্য গ্রন্থাগার স্থাপন করা একমাত্র কালোপযোগী উপায়।

সরকার এ-বিষয়ে সচেষ্ট হলে অনেক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু সমস্যা যেমন আছে, ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও তেমনি উজ্জ্বল। সরকারের সচেতনতার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এতগুলি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হয়ে গেল, তার মধ্যে প্রকাশন-শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে একটি পৃথক পরিকল্পনা কখনও রচিত হয়নি। রাশিয়ান বিপ্লবের পর সেখানকার নেতারা উপলব্ধি করেছেন যে জনসাধারণের হাতে বই তুলে দিতে না পারলে বিপ্লবের সুফল স্থায়ী হবে না। তাই তাঁরা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পুস্তক প্রকাশনের পরিকল্পনাও বিশেষভাবে যুক্ত করেছিলেন। এইরূপে তাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় রাশিয়া এখন পৃথিবীর অন্যতম পুস্তক-প্রকাশক হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

শুধু বাংলা প্রকাশনের কথাই আমরা এখানে আলোচনা করব। বর্তমান বাংলা প্রকাশনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে অন্যতম হল :

১) বইয়ের টাইটেল—সংখ্যাল্পতা।

২) ভাল বই হলে একটি বইয়ের বহুসংখ্যক কপি ছাপিয়ে প্রয়োজন মেটানো যেতে পারে। পাঠ্যপুস্তক উপন্যাস ছাড়া অন্যান্য বইয়ের মুদ্রণসংখ্যা সাধারণত ৫০০ থেকে ১,০০০ কপি মাত্র।

৩) জাতিগঠনমূলক বইয়ের একান্ত অভাব। এই অভাবটা যে কত বড় তা ১৯৫৮ থেকে ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দের হিসাব থেকে উপলব্ধি করা যাবে। এই কয় বছরে বাংলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উপরে মোট প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১,২২৩; এই কালখণ্ডের মধ্যে ইংরেজী ভাষায় (ভারতে) বেরিয়েছিল ১২,৫২০টি বই।

৪) বাংলা প্রকাশন ধীরে ধীরে কলকাতা-কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। এর ফলে সমগ্র বাংলার জীবনযাত্রার চিত্র, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি সাহিত্যে প্রতিফলিত হবার সুযোগ ঘটে না। কিন্তু গত শতকেও এরূপ অবস্থা ছিল না। সারণি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এটি ১৮৯৮ সালের হিসাব।

ডিভিশন	বইয়ের সংখ্যা	কপির সংখ্যা
বর্ধমান	৫৬	৫৩,২৫০
চট্টগ্রাম	২৩	২১,২০০
ঢাকা	১৮২	২,৪৬,৮৮৫
প্রেসিডেন্সী	৮৬	১,৪৫,৭০০
রাজসাহী	২৭	২০,১০০
কলকাতা	৯৬৮	১৭,৯১,০৯৩

এই হিসাব থেকে দেখা যায় যে, ঢাকা ডিভিশনে প্রকাশিত প্রত্যেকটি টাইটেল গড়ে ১,৩৫৬টি কপি প্রকাশিত হয়েছিল।

৫) বাংলা প্রকাশনার ক্ষেত্রে একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা ভারতের অন্য অঞ্চলে নেই। কিছুকাল পূর্বে ভারতে প্রকাশকদের যে পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় মোট প্রকাশকের সংখ্যা ১১,২৬০। এদের মধ্যে ইংরেজী বইয়ের প্রকাশক প্রথম স্থান অধিকার করে আছে; দ্বিতীয় স্থান হিন্দীর; বাংলা তৃতীয় স্থানের অধিকারী, বাংলায় মোট প্রকাশকের সংখ্যা ১,৪১৯। বাংলায় যে স্বল্পসংখ্যক বই বের হয় তার উপর নির্ভর করে এত প্রকাশক কি করে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করে সেটা বিস্ময়ের কথা। অধিকাংশ প্রকাশকই ক্ষুদ্র, কিছুসংখ্যক আছে মাঝারি, সুসংগঠিত বৃহৎ প্রকাশন সংস্থা নেই বললেই চলে। বাঙালী প্রকাশকদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। মোট প্রকাশকের মধ্যে ২৪০জন লেখক-প্রকাশক। অর্থাৎ লেখক নিজেই তাঁর বই ছেপে বের করেন। ভারতে আর কোনো ভাষায় এত বেশি লেখক-প্রকাশক নেই। অধিকাংশ তরুণ কবি এই শ্রেণীর প্রকাশক।

জীবনের সকল কাজের উপযোগী বাংলা বইয়ের ব্যবস্থা না করে বিদ্যালয় থেকে ইংরেজী পড়ানো ধীরে ধীরে তুলে দেবার পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীরা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত পাঠক্রমে বাংলার উপর জোর দেওয়ায় ইংরেজী এমনভাবে শেখানো হয় না যাতে ছাত্রছাত্রীরা প্রয়োজনে নিজেরাই ইংরেজী বই পড়ে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। পূর্বেই বলা হয়েছে বিদ্যালয়ে

যেসব বাংলা পাঠ্যপুস্তক পড়ানো হয় তাদের অধিকাংশই পরীক্ষায় পাশ করবার উদ্দেশ্যেই লেখা, জ্ঞানদানের জন্য নয়। পণ্ডিতদের লেখা বইয়ের মধ্য দিয়ে মৌলিক চিন্তার সংস্পর্শে আসবার সুযোগ না পেয়ে নব-প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের মানসিক দিগন্ত ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ছে, তাদের চিন্তাভাবনায় গভীরতার অভাব দেখা দিয়েছে। জাতির অগ্রগতির পথে এটা বাধা হয়ে দেখা দেবে। স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অথবা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে বাংলা বই পাবে না, এগিয়ে দেওয়া হবে ইংরেজী বই। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে বিদেশী ভাষার বই বুঝতে সমস্যায় পড়তে হবে। বাংলার মাধ্যমে যেসব ছাত্র শিক্ষালাভ করেছে, সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তারা পিছিয়ে পড়তে বাধ্য।

বিদ্যালয় থেকে ইংরেজী তুলে দিয়ে অনেক রাজ্য নানা সমস্যায় পড়ে আবার ইংরেজীর প্রবর্তন করেছে। এইসব কারণেই 'ইংলিশ মিডিয়াম' স্কুলগুলির এত সমাদর। বাংলা বইয়ের ব্যবস্থা না করেই ইংরেজী তুলে দেওয়ার এই যে তৎপরতা —তা কতটা রাজনৈতিক, কতটাই বা আন্তরিক—সে-বিষয় চিন্তা করে দেখা উচিত। যাদের ইংরেজী শেখানো হল না তাদের হাতে যদি বাংলা বই তুলে না দেওয়া যায় তাহলে কি আমরা ফিরে যাব সেই অন্ধকার যুগে, যখন বই ছিল না!

একটি বিদেশী ভাষা আমাদের উপর চিরকালের জন্য আধিপত্য বিস্তার করে থাকবে—এটা কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু বদলে যদি বাংলা বই না দেওয়া যায় তাহলে ইংরেজী বই না দিয়ে গত্যন্তর কি? কিন্তু বাংলাকে আমরা জীবনের ভাষা করব এটা যদি আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা হয় তাহলে সে-উদ্দেশ্যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। এবং তা করতে হবে অবিলম্বে। এর মধ্যে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তা হল—লাইব্রেরির জন্য বই কেনা, পুস্তক পর্ষদ গঠন ইত্যাদি—প্রয়োজনের তুলনায় যা খুবই সামান্য। কৃষি, অর্থনীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ের জন্য পরিকল্পনা রচিত হয়েছে, কিন্তু সমৃদ্ধ পুস্তক ভাণ্ডার গড়ে তোলবার জন্য কোনো সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা তৈরি হয়নি। এমনকি, প্রকাশন-শিল্পের সমস্যা কী, কত অর্থ এই শিল্পে লগ্নী করা হয়েছে, কত লোক কাজ করে, লেখক ও অন্য শ্রমিকদের আয় কিরকম, এই শিল্পের প্রসারের জন্য কী করা উচিত—এসব বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য একটি তদন্ত কমিটি পর্যন্ত গঠন করা হয়নি। অথচ প্রতি বছর কতরকম কমিটি যে সরকার নিয়োগ করেন তার ইয়ত্তা নেই। তাহলে বাংলাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার আগ্রহটা যে আন্তরিক তার প্রমাণ কোথায়? যে-কোনো ব্যাপারে এগিয়ে যাবার আগে জানা চাই কোথায় দাঁড়িয়ে

আছি। সেই জানাটাই এখনও অসম্পূর্ণ। যদি জীবনের সকল কাজ বাংলা ভাষার বই দিয়েই করতে হয় এবং জাপানকে যদি আমাদের নিকট আদর্শ হিসাবে ধরা যায় তাহলে বর্তমান বাংলা বইয়ের তুলনায় অন্তত পাঁচ থেকে আটগুণ বেশি বই প্রতি বৎসর ছাপতে হবে। এটা শুধু সাম্প্রতিক বইপত্রের কথা। আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য সম্বন্ধে গত দুই শতাধিক বৎসর যাবৎ যেসব বই বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে তাদের অনুবাদের কথাও এইসঙ্গে ভাবতে হবে। তাছাড়া ভারতের আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত যেসব মূল্যবান বই আছে তাদের পরিচয় নেওয়াও প্রয়োজন। পৃথিবীর ক্লাসিক্‌সগুলির সঙ্গেও বাঙালী পাঠকের পরিচয় থাকাও অত্যাবশ্যক। সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছাড়া এই বিরাট কাজ সুসম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান বা জাপানী সাহিত্য জাতির যে দাবি পূরণ করে, ভারতীয় সাহিত্যকে যদি সেই দাবি পূরণ করতে হয়, তাহলে কত বইয়ের প্রয়োজন? ডঃ সি. পি. রামস্বামী আয়ার মনে করেন যে, প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষার মোট পুস্তক-সংখ্যা অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশ লক্ষ হওয়া চাই। অর্থাৎ প্রত্যেকটি ভাষায় তিন-চার লক্ষ বই প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় সাহিত্যের উপর আমাদের দাবি এত ব্যাপক হবে যে, সেই তুলনায় এই সংখ্যা মোটেই বেশি নয়। মনে রাখতে হবে যে, কত বিচিত্র মনের ও শ্রেণীর বই দরকার হয়। পাঠ্যপুস্তক, শিশুপাঠ্যপুস্তক, বিভিন্ন বৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় বই, অভিধান, কোষগ্রন্থ ইত্যাদি নানা শ্রেণীর বই বিভিন্ন মানের পাঠকের জন্য বিভিন্নভাবে রচনা করতে হবে। সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য তো থাকবেই! গল্প-উপন্যাস-কবিতা-নাটক প্রভৃতির স্থান সকলের উপরে। সাহিত্যের ভিত্তিস্বরূপ দরকার দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বই। ভিত্তি যদি দুর্বল হয় তাহলে একমাত্র চূড়ার ঐশ্বর্য দিয়ে জাতীয় সাহিত্যের অস্তিত্ব রক্ষা পেতে পারে না।

ডঃ আয়ারের সিদ্ধান্ত যে অমূলক নয় তা দেখা যাবে ইংরেজী প্রকাশনের তথ্য থেকে। ইংরেজী বই (ইংলণ্ড ও আমেরিকা মিলিয়ে) সবসময় বিক্রির জন্য মজুত থাকে পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ টাইটেল। কিন্তু কেনার উপযোগী বাংলা বই তিন-চার হাজার পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ!

শিক্ষিত বাঙালীর দাবি মেটাবার জন্য আমরা যদি মৌলিক ও অনুবাদ-সহ এক লক্ষ টাইটেলের ভাণ্ডার গড়ে তুলতে চাই তাহলে আমাদের বর্তমানে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের অন্তত ষাট থেকে সত্তর গুণ বেশি বই ছাপতে হবে। এর অর্থ

এই যে, ততগুণ বেশি মূলধন, লেখক, শিল্পী, দপ্তরী, ছাপাখানা, কাগজ প্রভৃতি চাই। পরিকল্পনা ছাড়া এই বিপুল চাহিদা মেটানো অসম্ভব।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে যদি বাংলা বইয়ের অবাধ চলাচল থাকত তাহলে ভবিষ্যতে উভয় দেশেরই উপকৃত হবার সম্ভাবনা। ইংরেজী ভাষায় বই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবাধে চলাচল করে। তার ফলে পাঠকরা উপকৃত হয় এবং একটি বিশেষ দেশের প্রকাশন-শিল্পের উপর চাপ হ্রাস পায়।

জাতীয় সাহিত্য উন্নয়নের জন্য কিভাবে পরিকল্পনা রচনা করতে হয় তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতে পারে রাশিয়া থেকে। সোভিয়েট রাশিয়া গোড়া থেকেই বুঝেছিল যে, গণতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ় করবার জন্য উপযুক্ত বই হল সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। সুতরাং রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রকাশন-শিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে রাশিয়া এখন পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ পুস্তক-প্রকাশক। ১৯১৩ সালে রাশিয়ায় যে পরিমাণ পুস্তক প্রকাশিত হত সেই তুলনায় বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার প্রথম দশকের শেষে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল ৩৭ গুণ; দ্বিতীয় দশকের শেষে বৃদ্ধি পায় ৫৪৪ গুণ। ১৯১৩ সালে গড়ে একটি পুস্তকের ৩,৩০০ কপি ছাপা হত; ১৯৪৬ সালে এই গড় সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০,০০০।

স্ট্যালিনের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯২৮-৩২) অনুসারে ২,৩১,০০০ বই (টাইটেল) প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রকাশকদের ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী বই প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জীবনের যেসব বিভাগের উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল সেই সম্বন্ধীয় বই প্রকাশের জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। প্রাক্-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তুলনায় পরিকল্পনার শেষে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের পুস্তকের উৎপাদন কতগুণ বেড়েছে তা এই তালিকা থেকে দেখা যাবে:

বিষয়	কতগুণ বেড়েছে
সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি	৬·১
টেকনিক্যাল বই	৫·৬
বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতি	৫·৬
রাশিয়ান ভাষাসমূহের উপর বই (পাঠ্যপুস্তক, ম্যানুয়েল ইত্যাদি)	২
গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান	২·৯

এমনি করে প্রত্যেকটি পরিকল্পনার লক্ষ্য অনুযায়ী পুস্তকের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। ক্রমশ উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও জাতির যে বই আশু প্রয়োজন নেই তা প্রকাশ করতে উৎসাহ দেওয়া হয়নি। ১৯৫৬ সালে ৫[illegible],৫৩০খানি বই (টাইটেল) বেরিয়েছে। মোট কপি ছাপা হয়েছে প্রায় একশ সাতাশ কোটি। এর মধ্যে শতকরা ১৮ ভাগ হল বিজ্ঞানের বই। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে জাতীয় সাহিত্য উন্নয়নের ব্যবস্থা না থাকলে পুস্তক উৎপাদনের ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়া এরূপ বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করতে পারত না।

জাতীয় সাহিত্য উন্নয়নের পরিকল্পনায় রাশিয়া নিম্নলিখিত নীতিগুলি গ্রহণ করেছিল :

১) পরিকল্পনায় ব্যবহারিক জীবনের যেসব ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়েছে, সেসব বিষয় সম্বন্ধে বই রচনা করা।

২) প্রাদেশিক ভাষাগুলির উন্নতি সাধন করে সেইসব ভাষায় বই লেখার ব্যবস্থা। বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ায় [illegible]৯টি ভাষায় বই ছাপা হত ; এখন ১২২টি ভাষায় বই বের হয়। গণতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিক আত্মোন্নয়নের সুযোগ পাবে। সুতরাং সকল নাগরিকই যাতে তার মাতৃভাষায় বই পড়তে পায় সে-ব্যবস্থা করতে হবে ; এই সুযোগ না পেলে জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশ পিছিয়ে থাকবে। তাতে রাষ্ট্রেরই ক্ষতি।

৩) সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ লক্ষ্য রেখেছেন যাতে একই বিষয়ের বই অনাবশ্যকরূপে দুখানি প্রকাশিত না হয়। এর ফলে লেখকের শক্তির অপব্যয় এবং উৎপাদনের খরচ বেঁচেছে। এই নিয়ন্ত্রণ না থাকলে এত বেশিসংখ্যক নতুন নতুন বই অল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশ করা সম্ভব হত না।

৪) ১৯২৮ সালের রাশিয়ান বইয়ের শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশি প্রকাশিত হয়েছিল মস্কো ও লেনিনগ্রাড শহরে। বহুদিন যাবৎ উল্লেখযোগ্য বাংলা বই একমাত্র কলকাতা থেকেই বের হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বই প্রকাশের সুযোগ থাকলে সমগ্র দেশের জীবন ও সাধনার প্রভাব জাতীয় সাহিত্যের উপর পড়বে ; তাহলে দেশের জনসাধারণের সঙ্গে সাহিত্যের যোগাযোগটা ঘনিষ্ঠ হতে পারে। সোভিয়েট সাহিত্য উন্নয়নের দায়িত্ব যাঁদের হাতে ছিল তাঁরা প্রথম থেকেই পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থাকে দেশের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলিতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। প্রকাশনার ক্ষেত্রে মস্কো ও লেনিনগ্রাডের যে প্রাধান্য ছিল এখন তা ক্রমশ কমে এসেছে।

৫) আমাদের দেশে ছোট-বড় প্রকাশকের সংখ্যা প্রায় বারো হাজার। রাশিয়ায় আছে মাত্র দুশ'র কিছু বেশি প্রকাশন সংস্থা। এরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। সংখ্যায় অল্প বলে কর্তৃপক্ষ সহজেই এদের মাধ্যমে প্রকাশন-নীতি কার্যকরী করতে পারে। সরকার-নিয়ন্ত্রিত এই প্রকাশন সংস্থাগুলি রাশিয়ার জাতীয় জীবনে বিশেষ প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ১৯৩৫ সালে বিয়াট্রিস ওয়েব মন্তব্য করেছেন : "...in the U. S. S. R. it is the State publishing house, rather than the University professoriate or even the great army of school teachers, that is, in the service of general culture, the most potent agency."

রাশিয়ার পরিকল্পনার মূল আদর্শ গ্রহণ করে নয়া চীন কয়েক বছরের মধ্যে পুস্তক প্রকাশনায় আশ্চর্য সাফল্য লাভ করেছে। অনগ্রসর ভাষাগুলিকে উন্নত করা চীনেরও লক্ষ্য। আমাদের ভাষা সমস্যারও সমাধান এভাবেই করা যায়।

রাশিয়ার প্রকাশন পরিকল্পনা যে হুবহু গ্রহণ করতে হবে, তেমন কথা বলা হচ্ছে না। আমাদের দেশের অবস্থা অনুযায়ী সে-পরিকল্পনার পরিবর্তন ঘটানো চলে। তবে রাশিয়ার অসাধারণ সাফল্য যে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা যায় তাতে কোনো ভুল নেই।

বাংলা প্রকাশনের উন্নয়নের পথে অনেক বাধা, অনেক সমস্যা থাকলেও এর সম্ভাবনা উজ্জ্বল। প্রকাশন-শিল্প এমন একটি ক্ষেত্র—যেখানে প্রায় কোনো সুসংবদ্ধ কাজ হয়নি বলা যায়। এত কাজ করবার আছে যে, তার শেষ নেই। এই সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র থেকে এক বিরাট সংখ্যক মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালীর জীবিকার্জনের ব্যবস্থা হবে। তারা লিখবে, ছবি আঁকবে, বই ছাপবে, বাঁধাই করবে এবং বইয়ের ব্যবসা করবে।

ইংরেজীকে সুয়োরানীর আসনে বসিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উন্নয়নের ভাবনা অবাস্তব। ইংরেজীর মত শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ভাষার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাংলাকে পিছিয়ে পড়তেই হবে। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং সুদৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে অগ্রসর হতে পারলেই বাংলা বই জীবনের সকল ক্ষেত্রে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

পাঠপঞ্জী

১ *Current Publishing Trends in India.* Vol. V, No. 2. Indian Literature,

২ *Indian Publishing : Recent Trends.* Vol. IX, No. 4. Indian Literature,

উপরোক্ত দুটি প্রবন্ধের উপরেই 'স্টেটসম্যান' সম্পাদকীয় লিখেছিল। একটি সম্পাদকীয় '*Publishing Trends*' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭।

৩ বাংলা সাহিত্যের সম্ভাবনা। 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৬০

৪ জাতীয় সাহিত্য উন্নয়নের পরিকল্পনা। 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা,

৫ বইয়ের জগতে বাংলা। 'যুগান্তর',

৬ কা বই, কত বই। বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের দুইশত বৎসর-পূর্তি উপলক্ষে আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনীর স্মারকপত্রের জন্য লিখিত।

উপরোক্ত সবগুলি প্রবন্ধই বর্তমান লেখকের রচনা।